ফ্যানটম

কিশোরদের রহস্য উপন্যাস

চিরঞ্জীব সেন

কস্‌মস্‌-এর বই

পরিবেশক

মৌসুমী প্রকাশনী ।। ১ এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রকাশকাল
আশ্বিন ১৩৬৮

প্রকাশিকা :
তাপসী সেনগুপ্ত
কসমো প্রকাশ
১১ নিতাই বাবু লেন
কলকাতা-১২

মুদ্রক
মনোরঞ্জন নায়ক
শংকর প্রেস
৩৭/১/১, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন
রবীন সেনগুপ্ত

বাপ্পাদিত্য রায়
পিয়ালী ঘোষ ও
শুভজ্যোতি সেন কে

তোমাদের মামাজী
দাদু ও
দাদা।



লোকটা রাজুকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে

॥ সবুজ ভূত ॥

সেদিন ইসকুলে এসে কোনো রকমে বইগুলো ক্লাসে রেখে এসে পিনাকি হাঁফাতে হাঁফাতে তার বন্ধুদের কাছে বড় বড় চোখ করে বলল

জানিস কমলপুরে হালদারদের যে বড় হানাবাড়িটা পড়ে আছে না সেই বাড়িতে ভূত এসেছে

দুর, ওটা ত ভূতুড়ে বাড়ি, সবাই জানে, তপন বলল, তুই আর নতুন কি বলছিস, ভূত ত আছেই, আসবে আবার কি ?

তপনের কথায়, নীলু, বাপ্পা, পিংকু, হরিও সায় দিল। তারা বলল কমলপুরের সবাই ত জানে যে ওটা ভূতুড়ে বাড়ি, অমাবস্যার রাত্রে নাকি ওখানে বাড়ির ছাদে ভূত ঘুরে বেড়ায়, আমার ছোট মামা দেখেছে, নীলু বলল

কিন্তু তোমার ছোট মামা কি দেখেছে জানি না আমার ছোট কাকা পর্শু ঐ বাড়িতে স্বচক্ষে ভূত দেখে এসেছে, আমার ছোট কাকাদের ত ওখানে নারকেল বাগান আছে, ছোট কাকা মাঝে মাঝে নারকেল পাড়াতে ঐ গ্রামে যায়।

বাপ্পা জিজ্ঞাসা করল, তোর ছোট কাকা কি দেখেছে শুনি

হরি, আর পিংকু ওরাও তখন বলল, পিনাকি কি গাঁজাখুরি গল্প বলে শোনা যাক বলে ওরা দু'জন হো হো করে হেসে উঠল।

বাপ্পা বলল, কেন ভাই ওকে অমন করে ডাউন দিচ্ছিস, আমি

বাবার কাছে শুনেছি ঐ বাড়ির মালিক হালদার মশাই নাকি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ঘাড় গুঁজে পড়ে গিয়েছিলেন তাইতে উনি ঘাড় ভেঙে মরে গিয়েছিলেন, গয়ায় নাকি কেউ পিণ্ডি দেয় নি, তাই ঐ বাড়িতে তিনি ভূত হয়ে আছেন তবে কারও ক্ষতি করেন না।

গলা বাড়িয়ে, অশোক বলল, আমিও তাই শুনেছি, হালদার মশাই নাকি বাড়িতে একাই থাকতেন, সে যাক গে, তোর ছোট কাকা কি বলেছে রে পিনাকি, বল ত শুনি।

পিনাকি বলল: আমার ছোট কাকা পর্শু সকালে কমলপুরে গিয়েছিল নারকেল পাড়াতে। তা নারকেল পাড়িয়ে সে সব গরুর গাড়িতে বোঝাই করে ওখানে আমাদের এক কুটুম বাড়িতে যায়, সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে চা জল খাবার খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ উনি বাড়ির পথে রওনা হন।

কে একজন বলল সন্ধ্যা হয়ে গেল, হালদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবে, গা ছম ছম করবে না?

ও আপনারা হালদার বাড়ির ভূতের কথা বলছেন? সে ত অমাবস্যার রাত্রে দেখা দেয় বলে শুনেছি

না হে, কে বলছিল যে সন্ধ্যার পরই নাকি ওখানে অদ্ভুত একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছে

এই ত সবে সন্ধ্যা হল, এখন আর ভয়ের কি আছে। আমি খড়ি নদীর ব্রিজে গেলেই ত সাইকেল রিকসা পাব, তা ছাড়া সঙ্গে টর্চ আছে ভয় কি?

দরকার কি বাবু, আমি সঙ্গে একজন ছোকরাকে দিচ্ছি, তুমি যে খড়ি নদীর ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে সাইকেল রিকশায় উঠেছ সে খবরটা

:পলেও আমরা নিশ্চিন্ত হব, এই কালু, যা দাদার সঙ্গে যা, খড়ির পুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয় আর ফেরবার সময় ওখানে নন্দীর :দোকান থেকে খই কিনে আনবি।

তোর ধান ভাঙতেই শিবের গাজন শেষ, আসল ঘটনাটা বলত, হরি বলল।

হ্যাঁরে বাবা বলছি, পরে ত আবার কোশ্চেন করে জ্বালাতন করবি, হ্যাঁ তারপর

.তোর ছোট কাকার কত বয়স রে ? পিংকু জিজ্ঞাসা করল

তোরাই ত বাধা দিচ্ছিস, কত আর হবে ? আঠারো উনিশ হবে বোধ হয়, আর সেই কালুরও বয়স ঐ রকম হবে, তা ছোট কাকা আর কালু ত রাস্তা ধরে আসছে। সন্ধ্যা পার হয়েছে, রাস্তায় আলো নেই, উলটে রাস্তার দু'ধারের গাছ, আরও অন্ধকার মনে হচ্ছে। পাড়াগাঁ ত। সন্ধ্যা পার হতেই চারদিক নিঝুম, মাঝে মাঝে এক আধটা পাখি ডাকছে নয়ত কুকুর, শেয়াল

তুই দেখছি লেখকদের মতো বর্ণনা আরম্ভ করলি, তাড়াতাড়ি কর এখনি ঘণ্টা বাজবে, তপন বলল।

বাপ্পা বলল, ফার্স্ট পিরিয়ডেই আবার করালী স্যার আছে

থাম ত, পিনাকিকে বলতে দে, তপন বলল

হ্যাঁ তারপর ত ছোট কাকা আর কালু আসছে আর যেই সেই হালদার বাড়ির সামনে এসেছে আর অমনি গা হিম করা তীব্র এক চিৎকার, না চিৎকারের কোনো ভাষা নেই, ছোটকাকা বলল কি রকম অদ্ভুত একটা আওয়াজ।

কালু থমকে দাঁড়াল তারপরই 'পালান দাদাবাবু' বলে সে

ছুটতে আরম্ভ করল। ছোট কাকা তাকে ধরে ফেলল, থামিয়ে বলল

ভীতু কোথাকার ভূত বুঝি চিৎকার করে ? পাগলা শেয়াল বা কুকুরও ত হতে পারে।

না, দাদাবাবু আমাকে ছেড়ে দিন, এ নির্ঘাৎ চুড়েল ভূত, আমি পালাই। জোর করে হাত ছাড়িয়ে কালু আবার দৌড় লাগাল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তজল করা আবার সেই চিৎকার।

ছোটকাকা কি আর করে, সেও ছুটতে লাগল

নিশ্চয় তোর ছোটকাকাও ভয় পেয়েছিল, হরি বলল

তা জানি না, কিন্তু কয়েক পা ছোটবার পরই দু'তিন জন লোক তাদের পথ আগলে দাঁড়াল।

এই তোমরা ছুটছ কেন ? কি হয়েছে ?

যিনি জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কমলপুর থানার দারোগা সিরাজুদ্দিন সাহেব

হাঁফাতে হাঁফাতে কালু কোনোরকমে বলল চুড়েল ভূত ঐ হালদার বাড়িতে···

আরে চুড়েল মানে ত পেত্নী, পেত্নী কোথা থেকে এল ? বুঝেছি তোমরা ঐ বিচ্ছিরি আওয়াজ শুনে ভয় পেয়েছ, আমরাও শুনেছি, আমরা খোঁজ করতে যাচ্ছি ব্যাপারটা কি, কোনো মানুষও বিপদে পড়ে থাকতে পারে ত। চল আমাদের সঙ্গে, তোমার সঙ্গে ত টর্চ আছে, আমার কাছেও একটা আছে।

সিরাজুদ্দিন দারোগার সঙ্গে একটা বড় টর্চ ছিল আর সঙ্গে ছিল দু'জন ষণ্ডা মার্কা সেপাই। মোট তিন জন, তারপর কালু

ও ছোটকাকা। ইতিমধ্যে অন্ধকারে লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা আর একজন লোক কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে। তার কাঁধে একটা ঝোলা।

সে বলল, চলুন ত দারোগা বাবু, ব্যাপারটা কি দেখে আসি।

কালু যেতে চাইবে না, সে বলল, সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই শুনে ছোটকাকা বলল, একা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চুড়েল ভূত নির্ঘাৎ তোর ঘাড় মটকাবে তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে চল।

ঘটনা একটা সত্যিই ঘটেছিল। পিনাকি তাড়াতাড়িতে সংক্ষেপে বলেছিল, তার কথা তার বন্ধুরা কেউ বিশ্বাস করেছিল, কেউ করে নি।

সিরাজুদ্দিন দারোগা, তার দু'জন সেপাই, পিনাকির ছোট কাকা (ইস্ নামটাই বলা হয় নি, তার নাম মলয়), কালু আর সব শেষে আসা সেই আগন্তুক যার পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, কাঁধে ঝোলা। তারও হাতে একটা বেশ বড় টর্চ আছে। ঝোলায় কি আছে কে জানে।

ওরা মোট ছ'জন। হালদার বাড়ির কম্পাউণ্ড ওয়াল এককালে ছিল, এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, লোহার গেট ছিল, কে কবে খুলে নিয়ে গেছে। কয়েকটা গাছ আছে, যেমন আম, বেল, আমড়া ও চালতা গাছ।

সিরাজুদ্দিন দারোগা তার টর্চ জ্বালল, নতুন লোকটিও টর্চ জ্বালল। সিরাজুদ্দিন দারোগা অদৃশ্য কাউকে বা তার সেপাইদের লক্ষ্য করে বলল, সাবধানে পা ফেল হে, শেষে যেন সাপের ঘাড়ে পা

দিয়ো না। ওরা এগিয়ে চলেছে। নতুন লোকটি তার টর্চ জ্বালল তারপর কাকে বলল,

আরে তুইও এসেছিস, বেশ বেশ ভালই হয়েছে।

মলয় ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বাদামী রঙের দো আঁশলা কুকুর, লোকটির সঙ্গে তিব তির করে চলেছে। দারোগা বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনাকে ত মশাই চিনতে পারছি না ?

সে কি দারোগা বাব, আমি নদীর ওপারের কলমি ডাঙার নলিনী সাহার ভাই জীবন সাহা, এই ত আর মাসে আপনার সঙ্গে তাস খেলে গেলুম, এদিকে ত আমি প্রায়ই আসি

অ বুঝেছি। দারোগা বাবু আর কিছু বললেন না। হয়ত ভাবলেন হবেও বা।

সদর দরজা পার হয়ে উঠোন। উঠোনের পর থামওয়ালা বারান্দা। আট দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওরা বারান্দায় উঠল। বাঁ দিকে সিঁড়ি। একতলায় চারদিকে টর্চ ফেলে ওরা ভাল করে দেখল। আশ্চর্যের বিষয় ঘরগুলোর দরজা জানালা কেউ একেবারে খুলে নিয়ে যায় নি। নিচের তলাটা মোটামুটি পরিষ্কার, আগাছাও বড় একটা নেই। পায়ের কাছ দিয়ে দু'একটা ছুঁচো বা ইঁদুর সড়সড় করে চলে গেল। কুকুরটা তাদের ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে গরগর করতে লাগল।

চল হে হাজরা ওপরে উঠে দেখা যাক, দারোগা বলল। হাজরা হল একজন সেপাই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখা গেল সামনে টানা বারান্দা, আর দুটো মাত্র বড় বড় ঘর, বাকিটা ছাদ। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ঘর ফাঁকা। মেঝেতে একরাশ ধুলো।

এ ঘর দেখে ওরা পাশের ঘরে ঢুকল। পাশের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অবিশ্বাস্য সেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। ছাদের দিকে দেওয়ালে সবুজ রঙের প্রায় স্বচ্ছ ভূত। ছাদের দিকে একটা দরজা ছিল। দরজাটা ভেজানো ছিল। ভূত যেন মানুষ দেখে সেই ভেজানো দরজা ভেদ করে ছাদে চলে গেল।

জীবন সাহার সাহস খুব। সে ছুটে গেল। দরজা ঠেলে ছাদে গেল। কোথায় কি?

আশ্চর্য! সকলে নির্বাক। কালু কাঁপছে, বিড় বিড় করে কি বলছে। কুটুমরা ত বেশ সাহসী লোককে পাহারাদার হিসেবে মলয়র সঙ্গে পাঠিয়েছিল। মলয় মানে পিনাকির ছোটকাকা।

সকলে প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম কথা বলল জীবন সাহা, সে বলল

কই মশাই ভূত ত চিৎকার করল না

কি জানি মশাই, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। অথচ অবিশ্বাস করতেও পারছি না।

হাজরা বলল, অবিশ্বাস করার কি আছে? উনিই হালদার মশাই, ওপরে ওঠবার এই সিঁড়িতেই ঘাড় গুঁজে পড়ে গিয়েছিলেন। কখন পড়েছেন, কখন মরেছেন কেউ জানে না। পরদিন গরুর রাখাল খোল চাইতে এসে দেখে এই কাণ্ড।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি, চলুন ফেরা যাক। কাল সকালে যা হক ব্যবস্থা করা যাবে।

জীবন সাহা বলল, এ ত ভাল কথা নয়, মরবার সময় তার মুখে কেউ জল দেয় নি, মানুষটা জল পাবার আশায় ভূত হয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। ওনার আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে নয়ত আমিই গয়ায় যাব।

ওরা আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। প্রথমে কালু, তারপর মলয়, তারপর সেপাই দু জন, দারোগা বাবু, সবশেষে জীবন সাহা।

আবার। সিঁড়ির শেষ ধাপ নামার আগে দেখা গেল বারান্দার একটা থামে সেই সবুজ ভূত, যেন একটা মানুষের আবছা ছবি। তারপব সেই ভূত উঠোনে নেমে গিয়ে পাঁচিল ভেদ করে চলে গেল।

কালু তখন বলছে রাম রাম, রাম রাম!

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কালু বলল সে একা বাড়ি ফিরবে না। দারোগা বাবু সেপাই দু'জনকে বলল কালুকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। দারোগা বাবু, পিনাকির ছোট কাকা মলয় আর জীবন সাহা খড়ি নদীর পুলের দিকে যাবে। জীবন সাহা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সেই চিৎকার। জীবন সাহা ছুটে পালিয়ে এল। এবার খুব কাছেই আওয়াজ শোনা গেল, মনে হল যেন ওদের পাশেই।

এই হল কাহিনী। পিনাকি বলল তার ছোটকাকা এসব শুনেছে দেখেছে। একেবারে সত্যি। সত্যি না হলে মা শ্মশান কালির মন্দিরে পূজো দেবেন কেন? ছোট কাকার হাতে পুরুত মশাই একটা তাবিজ পরাবেন কেন?

ঐ দিন ঘটনার পর আশেপাশে সব গ্রামে হালদার বাড়ির খবর রটে গেল ফলে হল কি দিনে দুপুরে বিশেষ করে ভরাদুপুরে ঐ রাস্তা দিয়েই মানুষ চলা বন্ধ হয়ে গেল। একা কেউ যেতে সাহস করত না।

সিরাজুদ্দিন দারোগা এবং কমলপুর গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে দিনের বেলায় বাড়িখানা ভাল করে দেখে গেলেন। সবাই সাব্যস্ত করলেন আরও দু'চারদিন দেখা যাক তারপর না হয় জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা যাবে।

ঐ পর্যন্তই। হালদার বাড়ি নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। ভূতের বাড়ির কাছে আর কেউ যায় না। মাঠের মাঝে ভূতের বাড়ি একা পড়ে থাকে, হালদার মশাইয়েব ভূত একাই সেই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়।

॥ চাঁদু রাজু হারিয়ে গেল ॥

পরের সপ্তাহে পিনাকদের গ্রামে কলমি ডাঙায় এক কাণ্ড ঘটল।

কলমিডাঙা বেশ বড গ্রাম। পোষ্ট অফিস আছে, ডিসপেন-সারি আছে, বেশ কয়েকখানা বড় বাড়ি ও দোকান পাট আছে। কয়েকজন ধনী লোকও আছেন যাদের মধ্যে জীবন সাহার দাদা নলিনী সাহা একজন।

সুরেশ গুপ্তও কলমিডাঙার একজন নামী লোক। তিনি কবিরাজ। তাঁর কিছু চাষ বাস, পুকুর ও গোয়াল আছে। বিত্তশালী না হলেও সংসারে অভাব নেই। তবু ত বিনা পয়সায় রোগী দেখতে হয়।

নলিনী সাহা কিন্তু বিত্তশালী। পৈত্রিক সূত্রে বেশ কিছু নগদ টাকা, গয়না, রুপোর, কাঁসার ও পেতলের অনেক বাসন পেয়ে

ছিলেন। ধানী জমি আছে প্রায় পঞ্চাশ বিঘে, এছাড়া পুকুর, গরু, ছাগল, হাঁস আছে।

বাজারে নলিনী সাহার একটা দোকান আছে, সেই দোকানে মুদিখানা থেকে আরম্ভ করে স্টেশনারি, ধুতি শাড়ী, গেঞ্জী অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এসব ত আছেই, এর ওপর নলিনী সাহা জমি বা গহন বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়।

সুরেশ গুপ্ত নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট কিন্তু তার বন্ধু নলিনী সাহা সন্তুষ্ট নয় কারণ ব্যবসায়ে তাঁর নাকি সব সময়েই লোকসান যাচ্ছে। তবুও দু'জনে বন্ধুত্ব আছে।

এদের দু'জনে যেমন বন্ধুত্ব আছে তেমনি বন্ধুত্ব আছে এদের দুই ছেলের মধ্যে। দু'জনের বন্ধুত্ব অটুট, ভালবাসাও গভীর। দুজনের বয়স চৌদ্দ পনেরোর মধ্যে। পিনাকিরা যে ইসকুলে ও ক্লাসে পড়ে ওরা দু'জনও সেই ইসকুলে ও একই ক্লাসে পড়ে। ওরা ক্লাস নাইনের ছাত্র।

সুরেশ গুপ্তর ছেলের নাম চন্দন গুপ্ত, ডাকনাম চাঁদু আর নলিনী সাহার ছেলের নাম রাজকিশোর, ডাকনাম রাজু এবং ছেলেটিকে সত্যিই রাজপুত্রের মতোই দেখতে। চাঁদু কিন্তু কালো।

চাঁদু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, ব্যায়াম করে, খেলাধুলা করে, সাঁতার কাটে আবার পড়াশোনাতেও ভাল। রাজু মোটাসোটা ফর্সা, টিকলো নাক, টানা টানা চোখ, মাথাভর্তি কোঁচকানো কালো চুল। লেখাপড়ায় বা খেলায় চাঁদুর মতো চৌকশ নয়।

এবারও খবরটা পিনাকিই দিল। সেদিন ইসকুলে পৌঁছতে ওর লেট হয়েছিল। করালী স্যার সবে ক্লাসে ঢুকেছেন। চাঁদু আর

রাজু যেখানে পাশাপাশি বসে সেখানটা পিনাকি একবার দেখে নিয়ে পাশের ছেলেদের ফিস ফিস করে বলল

এই জানিস কাল সন্ধ্যা থেকে চাঁদু আর রাজুকে পাওয়া যাচ্ছে না। পিছনের সিটে ছিল পিংকু, সামনের সিটে হরি আর বাপ্পা। তারাও শুনল, আরও কেউ কেউ শুনল কিন্তু করালী স্যার ভীষণ কড়া তাই তখন খবরটা আর বেশি দূর ছড়াতে পারল না।

পিরিয়ড শেষ হতেই যেই করালী স্যার ক্লাসের চৌকাঠ ডিঙিয়েছে অমনি বাপ্পা চেঁচিয়ে উঠল, যত খবর সবই কি পিনাকির কাছে আগে পৌঁছয়? অল ইণ্ডিয়া রেডিও

কি হয়েছে? কি হয়েছে রে? পিছনের বেঞ্চি থেকে পটলা, বাবুয়া আর নিমু চেঁচিয়ে উঠল।

পিনাকি তখন বলল, কাল সন্ধ্যা থেকে চাঁদু আর রাজু দুই মানিকজোড়কে পাওয়া যাচ্ছে না। জামতলার মাঠে ওরা ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল, সেখান থেকে আর ফেরে নি। আমাদের বাড়িতে ওদের বাড়ির লোক খোঁজ করতে এসেছিল। কাল সারারাত্রি খোঁজা হয়েছে তবুও পাওয়া যায়নি, আজ নাকি মল্লিক দীঘি, সামন্তপুকুর আর কোথায় নাকি জাল ফেলা হবে।

পটলা বলল, ওরা নিশ্চয় বাড়ি থেকে পালিয়েছে। পিনাকি বলল তাহলে ত জামাকাপড় আর টাকাকড়ি নিয়ে যাবে কিন্তু ওরা ত হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে খেলতে গিয়েছিল। সেই পরেই নিরুদ্দেশ। ওদের মা বললেন বাড়ি থেকে একটা গামছা পর্যন্ত হারায় নি।

তাহলে আর যাবে কোথায়, দেখিস আজ ঠিক ফিরে আসবে,

জামতলার মাঠে যাদের সঙ্গে ম্যাচ দিতে গিয়েছিল তাদেরই কারও বাড়ি গিয়ে বসে আছে। আজ মাছের মুড়ো দিয়ে ঝোল ভাত খেয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরে আসবে দেখিস।

ওরে বাবা, চাঁদু যদিও বা খেতে বাজি হয় রাজু সেরকম ছেলেই নয়। সে বলে মামার বাড়িতেই খায় না।

টিফিনের সময় সারা ইসকুলেই খবরটা রটে গেল, চাঁদু আর রাজু হারিয়ে গেছে। তাদের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ কোনো সন্ধানও দিতে পারছে না। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে। ছেলেরা সবাই ভাবতে লাগল কোথায় ওরা যেতে পারে? কোনো পিশাচ বোধহয় চোখের দৃষ্টিতে ওদের সম্মোহিত করে ধরে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরছিল ত!

একজন বলল, ঠিক বলেছিস, জামতলার মাঠ থেকে ফেরবার পথে ঐ বুড়ি তুলির মায়ের খড়ের চালের ধারে যে মস্ত বড় বট গাছটা আছে সেখানে আমি পর্শুদিন জটাওয়ালা একটা সাধুকে বসে গাঁজা টানতে দেখেছি। বাবাঃ দেখেই আমার যা ভয় করল না আমি ত ছুটে পালিয়ে এসেছি। সে কি ভীষণ চাউনি রে। সব শুনে কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেল। তারা ঠিক করল এবার থেকে তারা সন্ধ্যার আগেই দলবেঁধে বাড়ি ফিরবে, একা আর নয়।

তবে একজনের সাহস একটূ বেশি। সে বলল, চল না আজ ছুটির পর আমরা বটতলাটা দেখে আসি, সেই সাধুটা আছে কি না, থাকলে আমরা সবাই মিলে তাকে ধরব।

সত্যিই ওরা ছ'সাত জন ছেলে দল বেঁধে সেই বটতলায়

গিয়ে দেখল সাধুবাবা নেই তবে অনেক পোড়া কাঠকয়লা পড়ে আছে।

সারা গাঁয়ে শোকের ছায়া। ছেলে দু'টো গেল কোথায়? বাপ-মা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সামলাতে ব্যস্ত হলেন। গ্রামের যুবকল্যাণ সমিতির ছেলেরা গ্রামের বাইরে রাস্তায় সন্ধ্যার পরে টহল দিতে আরম্ভ করল।

দু'দিন কেটে গেল চাঁদু আর রাজুর কোনো খবর নেই। ওদের মায়েরা অন্নজল ত্যাগ করেছেন, সবসময়ে ঠাকুর ঘরে পড়ে আছেন।

॥ ভুতুড়ে বাড়িতে ॥

ঘটনাটা এই রকম ঘটেছিল।

দুলির মায়ের খড়ের চালার পাশে বটগাছটা বিরাট, অন্ততঃ কুড়িটা ঝুরি নেমেছে। জায়গাটা সত্যিই নির্জন। দুলির মা কবে মরে গেছে কিন্তু চালাটা এখনও আছে। বটগাছটার ওধারে একটা ডোবা আছে। ডোবা ঘিরে অনেক গাছ। পাকুড়, আঁসস্যাওড়া, নিম, ডুমুর, বেশ জঙ্গল।

জঙ্গলের পর একটা সরু রাস্তা। রাস্তাটা খড়ি নদী পর্যন্ত গেছে, ওপারে কমলপুর।

জামতলার মাঠে ফুটবল খেলে চাঁদু আর রাজু দুই বন্ধু বাড়ি ফিরছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বেশি দেরি হলে বকুনি খেতে হবে। চাঁদু আগে যাচ্ছে কিন্তু রাজু পেছিয়ে পড়েছে। খেলার সময় তার ডান পায়ে বুঝি চোট লেগেছে তাই চাঁদুর সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে

পারছে না। খালি খালি ডাকছে এই চাঁদু দাঁড়া না। : বলছি পায়ে লেগেছে ত শুনছিস না।

এই ত আমি যাচ্ছি। বুঝেছি তুই ভয় পেয়েছিস।

মজা করবার জন্যে চাঁদু আর একটু জোরে হাঁটে। হঠাৎ চাঁদু যেন একটা আওয়াজ শুনল 'ইক্' তারপর সামান্য একটু ঝটাপটি। চাঁদু পিছন ফিরে দেখল রাজু নেই।

সেকি? কোথায় গেল। ও তখন বটগাছটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বটতলায় ফিরে এসে 'রাজু' 'রাজু' বলে দু'বার ডাকল কোনো সাড়া নেই। কোথায় গেল রাজু? রাগ করে উলটো দিকে যায় নি তো। চাঁদু ছুটে খানিকটা গেল। রাজুর পাত্তা নেই। ৩

চাঁদু ভয় পেয়ে গেল কিন্তু সে সাহসী ছেলে। সে বটতলায় এল। বটের কয়েকটা ঝুরি পার হয়ে ডোবার ধারে এল। কোথায় রাজু?

চাঁদু তখন বটগাছ পার হয়ে ডোবার ধারে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না; রাজু কোথায় গেল? হঠাৎ তার মনে হল রাজু বোধ হয় তার সঙ্গে মজা করার জন্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। তাই একটু চেঁচিয়ে বলল: রাজু ভাল চাস ত বেরিয়ে আয় নইলে আমি চললুম। তবুও কোনো উত্তর নেই।

চাঁদু তখন গলা বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। আরে ঐ সরু রাস্তা দিয়ে একটা মানুষ যাচ্ছে না? ঐ দূরে? লোকটার পিঠে ও কে? আরে ঐ ত রাজু! লোকটা রাজুকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে।

চাঁদু কি করবে ঠিক করতে পারে না। ফিরে গিয়ে কাউকে

ডাকবে? কিন্তু এখানে ত কেউ নেই। লোক ডাকতে ডাকতে ওরা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

লোকটার হাতে যদি ছোরা থাকে? ওকে দেখতে পেলে গুণ্ডাটা তাকে ছোরা মেরে দিতে পারে। তার চেয়ে সাবধানে ওদের ফলো করে দেখা যাক রাজুকে কোথায় নিয়ে যায়।

চাঁদু গাছের আড়ালে আড়ালে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোতে থাকে। রাজুর মুখটা যেন গামছা দিয়ে বাঁধা। ও বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

লোকটা রীতিমতো গুণ্ডা। দৈত্যের মতো দশাসই চেহারা। ওর সঙ্গে একা মারামারি করা অসম্ভব। একটা লম্বা গাছের ডাল টাল যদি পাওয়া যেত তাহলে না হয় পিছন থেকে লোকটার মাথায় প্রাণপণে এক ঘা লাগানো যেত। কিন্তু সে রকম কোনো ডাল পাওয়া গেল না। জায়গাটা অন্ধকার। অন্ধকার জমাট বাঁধছে, রাস্তাটাই ভাল দেখা যাচ্ছে না।

এখন গ্রীষ্মকাল। একটুও হাওয়া নেই। চাঁদুর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, গেঞ্জিটা ভিজে গেছে। তার ভ্রুক্ষেপ নেই। বন্ধুর বিপদ!

গুণ্ডাটা বেশ অবলীলায় এগিয়ে চলেছে। তার কাঁধে একটা ভার আছে বলে মনেই হচ্ছে না। চাঁদু ওকে অনুসরণ করে চলেছে, ওর মাথা দেখা যাচ্ছে কিন্তু চাঁদু হঠাৎ সভয়ে দেখল লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় গেল? চাঁদুরা এদিকে নদীর ধারে কখনও আসে নি তাই সে জানে না, জঙ্গলের শেষে নদীর খাত। লোকটা

রাজুকে নিয়ে হঠাৎ নিচে নদীর খাতে নেমে গেছে তাই দেখতে পায় নি।

যা হয় হবে, চাঁদু ছুটে নদীর ধারে এল। লোকটা জলের দিকে ছুটছে। ছোট একটা নৌকো রয়েছে। গুণ্ডাটা রাজুকে নিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল। তারপর দাঁড় বেয়ে ওপারের দিকে চলল।

চাঁদু এখন কি করবে? যা হয় হবে, সে আর কিছু না ভেবে আস্তে আস্তে জলে নেমে পড়ল। নদীতে এখন জল কম, বেশি চওড়াও নয়, এখন।

যতটা সম্ভব তফাতে থেকে মাথা নিচু করে চাঁদু সাঁতার কেটে ওপারে উঠল। প্যান্ট গেঞ্জি ভিজে সপসপ করছে। গেঞ্জিটা খুলে নিংড়ে মাথা আর গা মুছল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। ঘসা কাঁচের মতো আলো। চাঁদু একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল গুণ্ডাটা রাজুকে নৌকো থেকে আবার কাঁধে তুলে নিয়ে নদীর পাড়ে উঠল।

এদিকেও নদীর পাড়ে অনেক গাছ। গাছের আড়াল থেকে চাঁদু দেখল একটা লোক ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। গুণ্ডাটার গায়ে জামা নেই কিন্তু এই লোকটার গায়ে হাওয়াই সার্ট, পরনে পাজামা, হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। গোঁফ, দাড়ি, চোখে কালো চশমা।

রাজুকে লোকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা ঠেলা দিল। রাজু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। জামা পরা লোকটা রাজুকে টেনে তুলে তার মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে কি বলল, চাঁদু শুনতে পেল না। চাঁদু দেখতে পেল ওরা রাজুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু গুণ্ডাটা রাজুর একটা হাত ধরে আছে।

এবার ফাঁকা মাঠ। সর্বনাশ! চাঁদু কি করে ফলো করবে? মাঠের মাঝে মাঝে আল বা ঢিবি ঢাবা আছে তারই আড়ালে নিচু হয়ে নিজেকে যতটা সম্ভব লুকিয়ে চাঁদু চলতে লাগল।

চাঁদু কিন্তু ভয় পায় নি। এমনিতে তার সাহস অন্য ছেলের চেয়ে বেশি। এখন বন্ধুর বিপদে তার সাহস যেন অনেক বেড়ে গেছে।

মাঠের মধ্যে চাঁদু এমনই একটা জায়গায় এসে পড়ল যে সে আর এগোতে সাহস করল না। ধরা পড়ে যেতে পারে। সেইখানে আলের আড়ালে উবু হয়ে বসে লক্ষ্য করতে লাগল ওরা কোথায় যায়।

লোক দু'টো রাজুকে নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতেই চাঁদুও সাহস করে উঠে পড়ল। এবার ওদের ফলো করা যেতে পারে। ওরা হঠাৎ পিছন ফিরে ওকে যদি দেখে ফেলে তাহলে ও বুঝতে পারবে না যে একটা ছোঁড়া ওদের পিছু নিয়েছে, ভাববে এই গ্রামেরই কোনো ছেলে। চাঁদু উঠে ওদের ফলো করতে লাগল।

সামনে একটা পাকা রাস্তা, দু'পাশে গাছ। ওরা রাস্তাটা পার হল। ওপারে একটা পুরনো দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়িটা শুধু পুরনো নয়, গেট, কম্পাউণ্ড ওয়াল সব ভাঙা। এককালে বাগান ছিল এখন বাগান নেই, তবে দু'চারটে বড় বড় গাছ এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝোপঝাড় ত আছেই।

চাঁদু একটা গাছের আড়ালে লুকলো। প্যাণ্ট আর গেঞ্জি শুকিয়ে গেছে। চাঁদু দেখল লোক দু'টো রাজুর হাত ধরে দরজা খুলে

বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। দরজাটা বন্ধ করল না। খোলাই রইল।

চাঁদু দেখল একটু পরে ওপরে কেউ আলো জ্বালল। হেরিকেন লণ্ঠন হতে পারে। চাঁদু এখন কি করবে ভাবছে। বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। দরজা ত খোলাই রয়েছে, লোকগুলোও ওপরে উঠেছে। বাড়িটা একবার দেখাই যাক না, ভেতরটা কেমন। পা টিপে গুঁড়ি মেরে চাঁদু বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল।

দরজার পর বেশ বড় উঠোন, সামনে থাম ঘেরা বারান্দা। বাঁ দিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। কি করবে? ওপরে উঠবে? হ্যাঁ উঠবে। রাজুর বিপদ। না হয় সেও বিপদে পড়বে।

ওপরে উঠে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দেখল সামনে লম্বা বারান্দা। পাশে ঘর রয়েছে। বারান্দায় ঢোকা বিপজ্জনক। তার বুক টিপ টিপ করতে লাগল, যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে সব কাজ পণ্ড।

গলা বাড়িয়ে দেখল, এধারের ঘরটা ফাঁকা, ওরা ওধারের ঘরে কথা বলছে। কথা শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আলো ঐ ঘরেই জ্বলছে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চাঁদু বারান্দায় ঢুকে পড়ল। যেমনি ঢোকা অমনি একটা লোক ঘর থেকে বেরিয়ে কোনো দিকে না চেয়ে ভাগ্যিস উল্টো দিকের ঘরটায় ঢুকে পড়ল নইলে এখনি বিপদ হত।

কিন্তু লোকটা বোধ হয় এখনি ঘর থেকে বেরোবে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল এদিকে ছাদে যাবার দরজা এবং দরজার একটা পাল্লা নেই। চাঁদু চট করে ছাদে চলে গেল। ছাদটা ছোট। কিন্তু একটা

জিনিস সে আবিষ্কার করল। ওধারে ঘর দু'টো বরাবর একটা টানা বারান্দা রয়েছে।

চাঁদু বারান্দায় চলে গেল পা টিপে টিপে। ইস্ কি ভীষণ মশা। মশা মারতে ইচ্ছে করছে কিন্তু মারলেই ত চটাস্ করে শব্দ হবে আর ও ধরা পড়ে যাবে। চাঁদু গুঁড়ি মেরে ওধারের ঘরের জানালার নিচে দেওয়াল ঘেঁসে বসল।

ঘরে তিনজন লোক কথা বলছে, তিন রকম গলা। একজন বোধ হয় এই বাড়িতেই ছিল!

একজন বলল, এই শশে' তুই ত বললি ছোঁড়াটা'র আচমকা মুখ টিপে ধরে কাঁধে ফেলে ওকে ধরে আনলি তারপর ডোবার ধারে জঙ্গলে এনে গামছা দিয়ে ওর মুখ আর হাত বাঁধলি, তা ছোঁড়াটা কি একাই আসছিল নাকি?

একা কেন আসবে?

শশী তুই একটা গাড়ল, তোর হোঁতকা চেহারাটাই আছে, মাথায় কোনো বুদ্ধি নেই, একা যদি ছিল না ত সঙ্গে যারা ছিল তারা কি করল, কোথায় গেল?

কোথায় আবার যাবে? আপনার যেমন কথা, একটাই ছোঁড়া ওর আগে আগে যাচ্ছিল, আমি না পিছন থেকে এই সাদা ছোঁড়াটাকে ঘপ করে ধরে ফেলেছি।

বেশ করেছিস তা অন্য ছোঁড়াটা তোকে দেখেছে নিশ্চয়।

কি করে দেখবে? ও ত যাচ্ছিল আগে, আমি ত একে কাঁধে তুলে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি, সেই ছোঁড়াটা একবার রাজু না রাধু কি বলে ডাকল তারপর সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে দে ছুট। ভয় ত

পাবেই, সবাই ত জানে ঐ ঝুরিওয়ালা বটগাছে মামদো ভূত আছে।

বেশ করেছ, এখন সে ছোঁড়া ফাঁড়িতে গিয়ে খবর না দেয়।

খবর দিয়ে কি করবে? কেউ কি জানে যে আমরা ছেলেমেয়ে গুলোকে এই ভূতের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি? ভূতের ভয়ে ত এদিকে কেউ হাঁটেই না, হুঁ হুঁ, তোমার বুদ্ধি খুব।

লোকটা হাসতে লাগল। চাঁদু তখন বুঝল যে এ বাড়িতে আরও ছেলে আছে। এরা ছেলেধরার দল। সে যে ওদের অনুসরণ করে এই বাড়িতে ঢুকেছে ত' ওরা টের পায়নি। আচ্ছা পিনাকি কি ইসকুলে এই বাড়িটার কথাই বলছিল নাকি? এইটেই কি হালদার বাড়ি? এই বাড়ি থেকেই সেই বিশ্রী চিৎকার শোনা যায়? এই বাড়িতেই কি সেই সবুজ ভূত ঘুরে বেড়ায়?

লোকগুলো ত ভীষণ পাজী। গ্রামের লোকেদের নকল ভূত দেখিয়ে আর ভূতের চিৎকার শুনিয়ে ওরা এটাকে ভূতের বাড়ি বলে চালিয়ে ছেলেধরার ব্যবসা ফেঁদেছে।

ওরা কি বলছে যেন। চাঁদু কান পেতে শুনতে লাগল। অন্য একটা মানুষ কথা বলছে, আর এর গলাটা মেয়ে মানুষের মতো সরু। মেয়ে মানুষ নয় ত? হতে পারে। মেয়ে মানুষটা হয় ত পাহারায় থাকে। সে বলছে

একে ত দেখে মনে হচ্ছে বড়লোকের ছেলে, তা হ্যাঁ গো সদ্দার এর বাবা যদি পুলিসে খবর দেয় তাহলে কি করবে?

তুই থাম মানদা আমি অত বোকা নই, যাতে পুলিসে খবর না দেয় তার ব্যবস্থা করব।

তবুও যদি দেয়।

তাহলে জেনে রাখ এই ছেলেকে শেষ করব, যমের বাড়ি পাঠিয়ে দোব, ওর লাসটা ওর বাপেব কাছে পাঠিয়ে দোব।

কথাগুলো যে বলল চাঁদু তার সেই সময়ের মূর্তি দেখলে নিশ্চয় ভয় পেত লোকটা দু'হাতে ঘুঁসি পাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল।

মানদা বলল, সে ত আমরা জানি তবুও জিজ্ঞাসা করলুম।

শশী শোন, পাশের ঘরটা আজই সাফ কর, মেয়ে দুটো আর ছেলেটাকে ঐ ঘরে রাখ, কাল তুই কলকাতা যাবি। নারাণ মণ্ডলকে গিয়ে বলবি আমি এগুলোকে আর আটকে রাখতে পারছি না। টাকা যোগাড় করে যেন তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়।

নারাণ মণ্ডল এদের কোথায় নিয়ে যাবে সদ্দার? মানদা জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েদু'টোকে ত আরব দেশে পাঠাবে আর ছেলেটাকে কোথায় বেচবে তা আমাকে বলে নি। ওসব কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবি না। ওদের খাবার কি করেছিস?

রুটি আর কুমড়োর তরকারি আর গুড়।

আবার গুড়, যাকগে শশী আমি এখন চললুম, দেখি একবার কলমিডাঙ্গা যাব, কাল আবার আসব, আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবি না। আমাকে আলো দেখা।

চাঁদু দেখল ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। তাহলে ওরা নিচে নামছে। এই সুযোগে আমিও পালাই, চাঁদু ভাবল, নাকি রাজুর সঙ্গে কথা বলবে? কিন্তু মানদা যদি ঘরে থাকে। দরকার নেই এখন পালাই পরে দেখা যাবে।

চাঁহু বারান্দা দিয়ে ছাদে এল। ছাদ পেরিয়ে বারান্দায় ঢুকল তারপর সিঁড়ির মুখে। দেখল তিনজন নেমে যাচ্ছে। ওরা তখন শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে, এবার বারান্দায় গেল। বারান্দা পেরিয়ে নিশ্চয় উঠোনে নামবে। সিঁড়ি এখন অন্ধকার। চাঁহু সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দায় এসে আগে থামের আড়ালে লুকালো। ওরা তখন দরজা খুলে বাইরে বোরোচ্ছে।

চাঁহু আগেই দেখেছিল একটা পাতকুয়ো আছে, ও ভাবছিল ওরা বাইরে বেরোলেই ও ছুটে উঠোনে নেমে পাতকুয়োর আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। মানদা আর শশী ফিরে এসে ওপরে উঠলে তখন ও পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালাবে।

উঠোনে নামতে যাচ্ছে আর তখনি শুনতে পেল সর্দার চাপা গলায় বলছে, এই বাইরে আলো আনিস না। কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে, যা তোরা ভেতরে যা, চাঁদ উঠেছে আমি ঠিক চলে যাব। চাঁহু আর উঠোনে নামতে পারল না সে শুধু দূরের থামটার আড়ালে সরে গেল।

হাতে আলো নিয়ে শশী আর মানদা যখন ফিরছিল তখন চাঁহু মানদাকে দেখতে পেল। ওরে বাবা মেয়েমানুষ ত নয় যেন একটা ভাল্লুক। শশীটা একটা নিগ্রো দৈত্য। দেহটা যত বড় মাথাটা সেই পরিমাণে ছোট। সর্দারকে দেখা গেল না কিন্তু গলার স্বরটা সে কোথায় যেন শুনেছে।

যাক শশী আর মানদা ওপরে গেল। চাঁহুও থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে কিন্তু সে সরদারকে দেখতে পেল না।

।। আশ্রয় মিলল ।।

চাঁহু ভাবল সে এখনি যে করে পারে কলমিডাঙ্গায় ফিরে গিয়ে রাজুর বাবাকে খবর দেবে কিন্তু রাজুর বাবা যদি হৈ চৈ বাধায়, পুলিসে খবর দেয় তাহলে ওরা ত রাজুকে মেরে ফেলবে, মেরে না ফেললেও টের পেলে এখান থেকে তখন অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে কলমিডাঙাতেও নিশ্চয় এদের চর আছে।

এতক্ষণ টের পায় নি। ইস কি ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। প্রচণ্ড ক্ষিধে, পেট চুঁই চুঁই করছে। কোথায় খাবার পাব, পয়সা নেই, কাছে কোনো দোকান পাটও দেখা যাচ্ছে না। এদিকে সে কখনও আসে নি, কিছু চেনে না, কোন দিকে যাবে?

চাঁহু যদি রাস্তায় নেমে তার বাঁ দিকে যেত তাহলে মিনিট পনেরো হাঁটলে খড়ি নদীর ব্রিজে পৌঁছে যেত। জায়গাটা শহরের মতো, সেখানে খাবারের দোকান আছে।

চাঁহু বাঁ দিকে না যেয়ে ডান দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। চাঁহু বাড়ির কথা ভাবছে। সে আর রাজু এখনও বাড়ি ফিরল না, নিশ্চয় খোঁজাখুজি পড়ে গেছে।

চাঁহুর বরাত ভাল। গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় চাঁদের আলো পড়ছে। গুমোটের পর এখন একটু হাওয়া দিচ্ছে। একটা শেয়াল রাস্তা পার হল। চাঁহুর বেশ মজা লাগছে। সে কত অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছে, এখন নিজেই অ্যাডভেঞ্চার করছে।

ডান দিকে একটা সরু রাস্তা। রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াতেই আলো দেখতে পেল। নিশ্চয় একটা গ্রাম বা পাড়া। চাঁদু সেই দিকে হাঁটতে লাগল। তাকে তখন অ্যাডভেঞ্চার পেয়ে বসেছে। মনে মনে বেশ পুলক আর রোমাঞ্চ অনুভব করছে। দেখাই যাক না কি হয়।

হ্যাঁ এটা একটা বেশ বড় পাড়া। একটা বাড়ি দেখতে পেল। দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে চাঁদু চাঁদের আলোয় দেখতে পেল সামনে বেশ বড় উঠোন। উঠোনের ওধারে একটা একতলা পাকা দালান বা বাড়ি। সামনে রক। রকে বসে দুটো ছোট মেয়ে হেরিকেনের আলোয় বোধ হয় লুডো খেলছে। এধারে একটা চালাঘর রয়েছে, সেখান থেকে কড়ায় খুন্তি নাড়ার আওয়াজ আসছে, কেউ রান্না করছে। গোয়ালও আছে ভেতরে কোথাও। গরুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। একটা ছোট আম গাছও দেখা যাচ্ছে। . বেশ সম্পন্ন পরিবার মনে হচ্ছে।

দূরে কোথাও একপাল শেয়াল একযোগে চিংকার করে উঠল। খড়ি নদী বোধহয় কাছেই, নদীর ধারে বোধহয় বাসা। সেখানে ধ্বনি দিচ্ছে, চলবে না, চলবে না, আমাদের দাবি মানতে হবে।

শেয়ালের ধ্বনি শুনে চাঁদু চমকে উঠল। আর থাকা যাচ্ছে না, যেমন ক্ষিধে পেয়েছে তেমনি তেষ্টা। দরজা পার হয়ে চাঁদু বাড়িব ভেতরে গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে একটু কাশল।

কাশি শুনে মেয়ে দু'টি মুখ তুলে চাইল। কিন্তু ভয় পেল না। দেখে বুঝল ছেলেটা চোর ডাকাত নয়। যে মেয়েটা বড় সে হাঁক পাড়ল, অ মা দেখ কে একটা ছেলে কি চাইছে

কে ছেলে ? কি চায় ? কাদের ছেলে ?

কে জানে কে ? নাম জানি না, এই তুমি কে ? বড় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল। ছোট মেয়েটিও চুপ করে রইল না। সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ? কোথায় থাক ?

কই দেখি, বলতে বলতে হেরিকেন লণ্ঠন হাতে আধাবয়সী একজন মহিলা এলেন। বাঁ হাতে আলো ডান হাতে একটা বড় খুন্তি। আলো তুলে ধরে চাঁদুর মুখখানা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কে রে ? তোকে দেখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না, তোর নাম কি ? কোথায় থাকিস ?

চাঁদু স্রেফ নিজের পরিচয় চেপে গেল। সত্যি পরিচয় দিলে এখনি বা কাল সকালে ওদের গ্রামে খবর চলে যাবে এবং তাতে বাজুর বিপদ বেড়ে যেতে পারে। চাঁদু বেশ সহজভাবেই বলল তবে মুখ কাঁচুমাঁচু করে যে সে গাবতলী গ্রাম থেকে আসছে। কাজের সন্ধানে হেঁটে কলকাতা যাবে কিন্তু রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ক্ষিধেও পেয়েছে খুব, একটু আশ্রয় চায়, নাম বলল নিমাই।

চাঁদুর গায়ের রং কালো হলেও মুখখানা বেশ ভাল। দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে তার ওপর এখন ক্ষিধে তেষ্টায় মুখখানা শুকিয়ে গেছে আর মহিলার বোধহয় নিজের ছেলে নেই। চাঁদুকে তাঁর বেশ ভাল লাগল। তিনি বললেন

তা তুই কলকাতা যাচ্ছিস কেন ? রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস বুঝি ? বাড়িতে তোর কে আছে ?

বাবা আর সৎ মা।

সৎ মা ? আহা রে।

চাঁদুর আশ্রয় মিলল। মহিলা তাকে পেটভরে খেতে দিলেন। মেয়ে দু'টির নাম মিঠু আর দীপা। বড়টির বয়স বোধহয় দশ আর ছোটটি বোধহয় আট, ভীষণ চঞ্চল, খিল খিল করে হাসে।

কিছুক্ষণ পরে সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ির কর্তা, মেয়ে দুটির বাবা রায়মশায় অর্থাৎ দুর্গাদাস রায় এলেন। পরিশ্রান্ত চাঁদু তখন রকের একপাশে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাকে দেখেই রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, ছোঁড়াটা কে?

সব শুনে এবং মুখ দেখে বললেন ছেলেটা ত ভাল বলে মনে হচ্ছে, নিশ্চয় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, নামধাম সত্যি বলেছে ত মনে হচ্ছে না। যাইহক চোখে চোখে রেখ, আমি কাল শহরে দেখব কারও ছেলে পালানোর খবর আছে কি না।

দুর্গাদাস বাবু মহকুমা শহরে রেজেষ্টারী অফিসের হেডক্লার্ক। মানুষ ভাল। ওর স্ত্রী সাবিত্রী দেবীও স্নেহময়ী ও ধর্মপরায়ণ মহিলা। তিনি বললেনঃ দেখ ছেলেটা থাক না আমার কাছে, আমার ত দেখেই মায়া পড়ে গেছে।

দুর্গাদাস বাবু কোনো উত্তর দিলেন না। নীরবে তামাক খেতে লাগলেন। তিনি জানেন মিঠু দীপার মায়ের পুত্র সন্তানের ভারি শখ।

পরদিন সকালে সাবিত্রী দেবী পুকুর থেকে কাপড় কেচে এসে দেখলেন উঠোনের একধারে তাঁর যে শাক বাড়ি আছে সেখানে খুরপি দিয়ে চাঁদু আগাছা তুলছে। কাজের ছেলে ত। জিজ্ঞাসা করলেন

হ্যাঁরে নিমাই মুখ ধুয়েছিস?

হ্যাঁ, নিমের ডাল ভেঙে দাঁতন করে টিউবকলের জলে মুখ ধুয়ে এসেছি।

এই মিঠু ঐ হাঁড়িটায় একটু জল বসা না রে, আমি আসছি।

মিঠুর মা মিঠু, দীপা ও চাঁহুকে বেতের ছোট ধামায় করে মুড়ি মুড়কি দিলেন আর এনামেলের বাটি করে চা দিলেন।

চা জল খাবার খেয়ে মিঠু আর দীপা রকে মাহুর পেতে তারস্বরে পড়তে বসল। চাঁহু আর কি করবে সে আবার সেই শাকবাড়িতে ফিরে গেল। ছোট্ট একটা নটে শাকের ক্ষেত ছাড়া কয়েকটা কাঁচা লংকার গাছ, পেঁপে গাছ, কাগজি লেবু আর একটা লাউ গাছ রয়েছে। খুরপি নিয়ে গাছের গোড়াগুলো পরিষ্কার করে খুঁচিয়ে দিতে লাগল।

গাছের গোড়া খুঁড়ছে বটে কিন্তু তার মন পড়ে আছে রাজুর দিকে। একবার রাজুর খোঁজ নিয়ে আসতে হবে কিন্তু কি করে যাবে? মিঠু আর দীপু হঠাৎ পড়া ছেড়ে উঠে এসে চাঁহুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল! এরই মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। ওরা চাঁহুকে নিমুদা বলতে আরম্ভ করেছে।

চাঁহু দেখল গোয়ালে মাত্র একটা গরু রয়েছে। গরু দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। মিঠু দীপার মাকে বলল

মা গরুটাকে একটু মাঠে চরিয়ে আনব?

তুই পারবি? তবে লালী খুব শান্ত, বেশি দূর যাস নে কিন্তু।

মা ডাক শুনেই সাবিত্রী দেবী গলে গিয়েছিলেন। রাজি হয়ে গেলেন। চাঁহুদেরও ত হু'টো গরু আছে। মাঠে গরু নিয়ে যাওয়া ওর অভ্যাস আছে। যাক বাড়ি থেকে বেরোবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। দেখি রাজুর খবর নিতে পারি কি না।

॥ রাজুর সন্ধানে ॥

লম্বা দড়ি আর গরুর গোঁজ নিয়ে চাঁদু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন বেশ বেলা হয়েছে। মিঠু আর দীপা একটু পরে ইসকুলে যাবে। ইসকুল থেকে ফিরে এলে ওদের সঙ্গে খেলতে হবে।

যাইহক, চাঁদু গরু নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। পাড়া থেকে কিছু দূরে গোঁজটা পুঁতে দড়ি দিয়ে গরু বেঁধে দিল। গরু মনের আনন্দে হাঁসহাঁস করে ঘাস খেতে লাগল আর চাঁদু ছুটল সেই ভূতের বাড়ির সন্ধানে যেখানে তার প্রাণের বন্ধু রাজু বন্দী হয়ে আছে।

বেশি দূর নয়। বাড়িটার সামনে এসে একটা ঝোপের আড়ালে বসে দেখতে লাগল। সামনে দরজা খোলা। দোতলার বারান্দা দেখা যাচ্ছে। কালকেই বাড়ি দেখে চাঁদু বুঝেছে একতলায় কেউ থাকে না কিন্তু দোতলার বারান্দায় মানদা বা শশী বা তাদের সর্দারকে দেখা যাচ্ছে না। বাড়িতে কেউ নেই নাকি? নাকি ঘরে রান্না করছে? আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না, মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই।

চাঁদু একটা কাজ করল। দুটো ঢিল তুলে নিল। ঠিক করে সে দু'টো ওপরের একটা ঘরের বন্ধ জানালা লক্ষ্য করে পর পর ছুঁড়ল। জানালায় লেগে বেশ জোর আওয়াজ হল। লোক থাকলে নিশ্চয় কেউ মুখ বাড়িয়ে দেখবে। না কেউ দেখল না। তাহলে

বাড়িতে কেউ নেই। মানদা বোধহয় নদীতে নাইতে গেছে আর শশী হয় ত বাজারে গেছে।

চাঁদু তখন বাড়ির পিছনে চলে গেল। বাড়ির ভেতর ঢুকতে সাহস হল না কারণ যদি কেউ এসে পড়ে!

বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখল একটা পেয়ারা গাছ আর একটা আম গাছ রয়েছে। দু'টো গাছের যে কোনোটায় উঠে দোতলার ঘরের ভেতর দেখা যায়। পেয়ারা গাছটায় লাল ডেঁয়ে পিঁপড়ে সড় সড় করে ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন সে আমগাছটাতে উঠল। আমগাছের পাতাগুলোও ঘন। লুকিয়ে থাকা চলে।

মা থাকে বরাতে বলে চাঁদু আমগাছে উঠে পড়ল। খুব সাবধানে উঠছে ডালপালার যেন শব্দ না হয়। কাকের বাসা ছিল বোধহয়। কাকটা কা কা করতে করতে উড়ে গেল। দূরে গিয়ে ডাকতে লাগল।

গাছে উঠতে গোড়াতেই কষ্ট তারপর গুঁড়ি পার হয়ে গেলে ত ইজি, সোজা। বাড়িটার এদিকে একটা ফালি বারান্দা। ঘরের জানালা। জানালাগুলোর গরাদ নেই, কেউ খুলে নিয়ে গেছে। গাছের ডালটা যদি ঐ বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছত তাহলে বারান্দায় লাফিয়ে নেমে পড়ে চাঁদু ঠিক রাজুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসত।

গাছের ডালে বসে চাঁদু একটা ঘরে দেখল দু'টো ফ্রক পরা মেয়ে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। হাত পা বাঁধা। চাঁদু অনুমান করল মেয়ে দু'টো ওদের বয়সী হবে কিন্তু ওদের গ্রামের মেয়ে নয়।

পাশের ঘরে ত রাজুকে দেখা যাচ্ছে না? ওকে সরিয়ে ফেলে নি ত? নাকি জানালার ঠিক নিচে শুয়ে আছে তাই এখান থেকে

দেখা যাচ্ছে না। চাঁদু তখন অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল রাজু-উ-উ-উ, রাজু-উ-উ-উ। কোনো সাড়া নেই। একটু পরে জানালায় রাজুর মুখ ভেসে উঠল।

চাঁদুকে দেখে রাজুর চোখে জল এসে গেল। কান্না ভেজা স্বরে বলল ঃ তুই কি কবে এলি ? এরা আমাকে ধরে রেখেছে।

আহা রাজুর মুখখানা একদম শুকিয়ে গেছে। কি চেহারা হয়েছে এক রাত্তিরে। দেখলে কষ্ট হয়।

রাজু, ভয় পাস না, আমি তোকে ঠিক উদ্ধার করব, না খেয়ে থাকিস না। বুড়োর মতো উপদেশ দিয়ে চাঁদু ওকে বলল কাল সন্ধ্যা বেলায় কি করে গুণ্ডাটাকে ফলো করে এসে বাড়িটা চিনে গেছে এমন কি কাল বাড়ির ভেতরেও ঢুকেছিল। সে আর বাড়ি ফিরে যায় নি, এই গ্রামেই একজনদের বাড়িতে নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আছে।

রাজুর শুকনো মুখ হঠাৎ আরো শুকিয়ে গেল। চাপা গলায় বলল। চাঁদু এখন পালা, কেউ আসছে বোধ হয় আমার পা বেঁধে রেখেছে রে।

ঠিক আছে, ভাবিস না রাজু, আমি তোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব, যা পারবি খাবি। শুকিয়ে থাকিস না, জোর কমে যাবে তুই পালা।

রাজু বোধ হয় শুয়ে পড়ল। চাঁদুও তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়ে এদিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে গরুর সন্ধানে চলল। গরুটার দড়ি খুলে নিয়ে কেউ পালায় নি ত ? পল্লীগ্রামে এমন ঘটনা ঘটে না তবুও করতে কতক্ষণ।

না কেউ গরু চুরি করে নি, বেশ নিশ্চিন্ত মনে তখনও ঘাস খাচ্ছে। গরু ঘাস খাচ্ছে। চাঁদু একটু এদিক ওদিক ঘূরে দেখল গ্রামটা বেশ সুন্দর, কত রকমের আর কত গাছপালা! একটা পদ্মপুকুরও দেখতে পেল। কি সুন্দর পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। পদ্মপাতা কেমন ভাসছে। বক, মাছ রাঙা নীলকণ্ঠ এমন কি একটা সুন্দর হলদে ইষ্টকুটুম পাখিও দেখতে পেল। তাদের কলমি ডাঙা গ্রাম এমন সুন্দর নয়। কিন্তু গ্রামে যেন লোক নেই। ক্বচিৎ দু'একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে।

গরু নিয়ে চাঁদু বাড়ি ফিরল। মিঠু দীপার মা বলল, এসেছিস বাবা, আমি ভাবছিলুম। চান করে আয় খেতে দিই।

মিঠু আর দীপু ইসকুল গেছে। পাড়ার আরও দু'তিনটে মেয়ে আসে, মুন্নি, রত্না, কুসুম কুমারী, ওরা দল বেঁধে রোজ ইসকুল যায়।

ভাত খেতে খেতে চাঁদু তার বন্ধুর কথা ভাবছে। আজ বেলা পড়লে আর একবার যাবে। পারে ত আজই রাজুকে নিয়ে পালিয়ে আসবে। ইস আমগাছটার ডালটা যদি আর একটু বড় হত!

এক কাজ করলে হয় না? ও যদি একটা লম্বা দড়ি যোগাড় করতে পারে আর সেই দড়ি আমগাছের ডালে বেঁধে দড়ির অপর প্রান্তটা বারান্দায় ফেলে দেয় তাহলে রাজু কি জানালা টপকে বারান্দায় এসে দড়ি ধরে গাছের ডালে উঠতে পারবে না?

পরক্ষণেই তার মুখ বিমর্ষ হল। রাজুর যে হাত পা বাঁধা থাকে। ওর ঘরে যদি ছুরি বা ব্লেড ফেলে দেয় তাহলে কি

রাজু বাঁধন কাটতে পারবে না ? যা বোকা ছেলে ! যদিও কিছুতেই উঠতে পারবে না। ও ত ভয়েই কুঁকড়ে আছে।

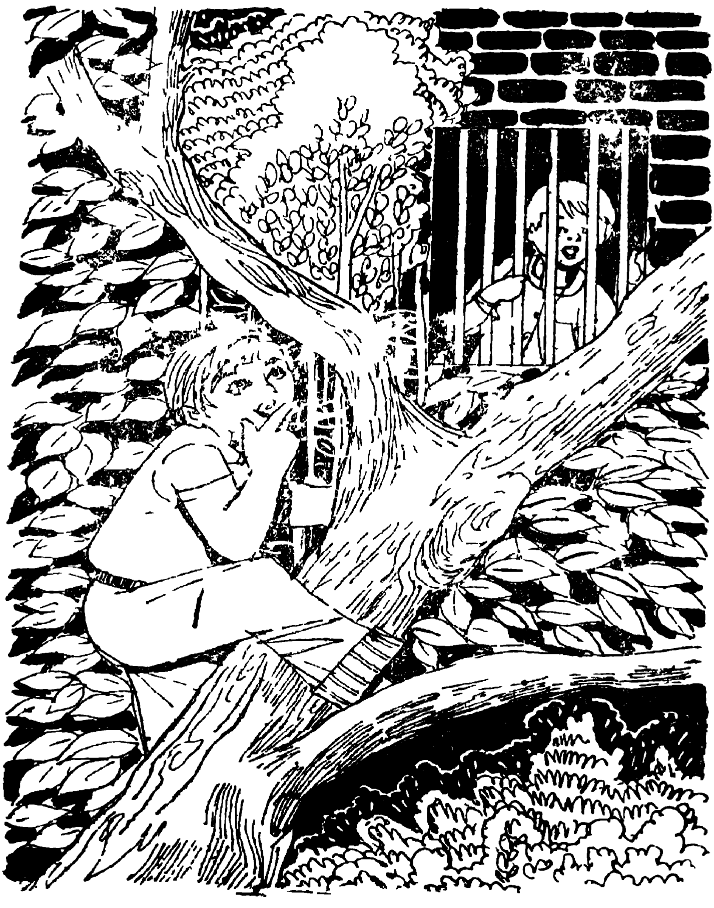
কিন্তু সেদিন চাঁদু বেরোতে পারল না উলটে এক ভুল করে বসল।

।। চাঁদুর ভুল ।।

বিকেলে মিঠু আর দীপার দু'বন্ধু মুন্নি আর রত্না খেলতে লাগল। চাঁদুকেও ওরা 'কুমির, কুমির' খেলতে ডাকল। খেলায় চাঁদুর মন বসছিল না। কি করে মন বসবে, তার মন পড়েছিল রাজু যেখানে বন্দী-হয়ে আছে সেখানে আর নিজের বাড়িতে ও বিশেষ করে মায়ের জন্যে চিন্তা হচ্ছিল। মা হয় ত খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কি করে খবর দেওয়া যায় ? একটা পোস্টকার্ড পেলে এখানকার ঠিকানা না জানিয়ে একটা খবর দেওয়া যায় যেমন তোমরা ভেবো না। আমি শীগগির ফিরব, নিরাপদে আছি। কিন্তু কাছে একটাও পয়সাই নেই ত পোস্টকার্ড।

তাই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল আর খেলায় ভুল করছিল। অন্যমনস্ক হয়েই সেদিন সন্ধ্যা বেলায় একটা ভুল করে বসল। মিঠু আর দীপা পড়ছিল দীপা সেলেটে ৪৪ কে ৯ দিয়ে ভাগ করছিল আর মিঠু ইংরেজি ওয়ার্ডবুক পড়ছিল।

ভাগ কসবার সময় দীপা ৫ খাইয়ে চুপ করে বসে পেনসিল চুষছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। চাঁদু বলল ৫ খাবে না, ৪ খাবে



একটু পরে জানালায় রাজুর মুখ ভেসে উঠল

আর ঠিক সেই সময়ে মিঠু পড়ছে এফ এল ও ইউ আর ফ্লোর মানে মানে ময়দা।

চাঁদু অমনি বলে ফেলল ফ্লোর নয়, ফ্লাওয়ার মিঠু দিদি।

দুই বোন অবাক হেয়ে চাঁদুর মুখের দিকে চাইল তারপর মিঠু হঠাৎ ছুটে মাকে বলতে গেল, মা মা চাঁদু ইংরেজি জানে। অঙ্ক জানে।

প্রায় তখনি সাবিত্রী দেবী এসে জিজ্ঞাসা করলেন: সত্যি করে বলত নিমু তুই কে?

চাঁদু প্রথমে চুপ করে গেল। তারপর মিঠুর মা যখন বললেন তোর কোনো ভয় নেই, আমাকে বল তোর বাড়ি কোথায়?

কলমিডাঙায়।

সে ত নদীর ওপারে·

হ্যাঁ।

তোর নাম কি সত্যিই নিমাই?

এবার কিন্তু চাঁদু মিথ্যা কথা বলল, না মাসিমা আমার নাম অজিতকুমার গুপ্ত, বাবা চটিজুতো দিয়ে মেরেছিল বলে পালিয়ে এসেছি।

চাঁদু যেভাবে কথাগুলো বলল তা মিঠুর মায়ের ঠিক বিশ্বাস হল না। ঠিক আছে মিঠুর বাবা ফিরলে তাঁকে একবার কলমিডাঙায় পাঠাবেন। ছেলেটা যদি অন্ততঃ গ্রামের নামটাও ঠিক বলে থাকে তাহলে গ্রামে গেলেই জানা যাবে কাদের ছেলে পালিয়েছে। তিনি আর কিছু না বলে নিজের কাজে চলে গেলেন।

মিঠুর বাবা দুর্গাবাবু বাড়ি ফিরতে মিঠুর মা তাকে সব বললেন।

দুর্গাবাবু বললেন, ঠিক আছে, কাল বিকেলে একটু অফিস থেকে বেরিয়ে কলমিডাঙ্গায় যাব এখন।

নলিনী সাহা কিন্তু দোকান খুলেছিল। গতকাল সন্ধ্যার পর যখন দোকানে বসে খবর পেয়েছিলেন যে রাজু বাড়ি ফেরে নি, রাত্তির আটটা হল, এখনও ফিরল না, বাড়িতে রাজুর মা খুব ভাবছেন তখন তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ছেলের খোঁজ আরম্ভ করেছিলেন।

প্রথমেই গিয়েছিলেন বন্ধু সুরেশ কবরেজের বাড়ি। সেখানে গিয়ে শুনলেন যে তারও ছেলে ফেরে নি। যতদূর পারলেন দুই বন্ধু বং পাড়ার ছেলেমেয়েরা খোজাখুজি করেছিল। এসব ত কালকের কথা।

আজ সকালে নলিনী সাহা দোকান খুলেছিলেন কিন্তু সারাদিন ছটফট করেছেন। চেনাশোনা ব্যক্তি ও আত্মীয়দের কাছে চিঠি দিয়েছেন। ঠিক করেছেন আজ না ফিরলে কাল থানায় যেয়ে দারোগা বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

সুরেশ কবরেজও ছেলের জন্যে খুবই চিন্তিত কিন্তু সেটা বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। চাতুর মা ত প্রায় সারাক্ষণই ঠাকুর ঘরে তাঁর রাধামাধবের বিগ্রহের সামনে বসে আছেন।

সারা দিনটা কেটে গেল কিন্তু চাঁতু বা রাজুর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা যারা শহরে যাওয়া আসা করে তারাও বাসস্ট্যাণ্ডে, রেলস্টেশনে ও দৈনিক যাত্রীদের কাছে খোঁজ

নিয়েছে ও নজর রাখতে বলেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো ফল হয় নি।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। সারাদিন ধরে যত খরিদ্দার আসে সকলেই সাহা মশাইয়ের কাছে রাজুর খবর জিজ্ঞাসা করে। আর সুরেশ কবরেজের কাছেও তার রোগীরাও খোঁজ নিচ্ছে।

রাত্রি ন'টা বাজল। দূরে রেল লাইন দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেন যাওয়ার আওয়াজ হল। ট্রেনটা খড়ি নদীর পুলে উঠলেই আওয়াজ শোনা যায়। সেই আওয়াজ শুনেই গ্রামের দোকানদাররা দোকান বন্ধ করতে আরম্ভ করে।

নলিনী সাহাও এইবার দোকান বন্ধ করবেন, কর্মচারীরা তোড়জোর করছে। সাহা মশাই হিসেবের খাতা খুলে হিসেব মেলাচ্ছিলেন আর ঠিক সেই সময়ে প্রায় তাঁর খাতার ওপর ঠক করে একটা ঢিল পড়ল। ছোট ঢিল। তাঁকে আঘাত করবার উদ্দেশ্য নয়।

মুখ তুলে দেখলেন যে ঢিলটা একটা কাগজ দিয়ে মুড়ে তাতে রবারের একটা গার্টার জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কি ব্যাপার? কোনো ছেলের দুষ্টুমি মতলব আর কি।

কাগজমোড়া ঢিলটা প্রথমে স্পর্শ করলেন না। ভ্রূকুটি করে একবার চেয়ে দেখলেন তারপর তুলে আর একবার চেয়ে দেখলেন তারপর আস্তে আস্তে রবারের গার্টারটা খুললেন। এবার কাগজখানা আস্তে আস্তে খুললেন।

আরে এ ত একখানা চিঠি! বেশ গোটা গোটা হাতের অক্ষর যেন কোনো ছোট ছেলে হ্যাণ্ডরাইটিং করেছে। চিঠিখানার নীচে

হু'লাইন আর একটা চিঠি। এই চিঠি লিখেছে রাজু। সাহা মশাই চিঠিখানা'পড়তে আরম্ভ করলেন। তাতে লেখা আছে

নলিনী সাহা

তোমার ছেলে রাজু আমার বন্দী। আসচে রোববার রাত্রি ঠিক দশটার সময় হুলির মায়ের বাড়ির কাছে ডুমুবতলায় একশ টাকার নোটে দশ হাজার টাকার পুঁটলি বেঁধে বেখে আসবে। একা যাবে। সাবধান সঙ্গে কোনো লোক আনবে না। টাকা রেখে দিয়ে বাড়ি ফিবে ;দেখবে তোমার ছেলেও বাড়ি ফিরেছে। আবার সাবধান। পুলিসেব কাছে গেছ কি তোমার ছেলে মরেচে। কলকাতাব পুলিসও আমাকে ভয় পায়। আমার নাম

ফ্যানটম

বাবা, টাকা দিয়ে দিয়ো। নইলে এরা আমাকে কেটে ফেলবে। একটা খাঁড়া আমাকে দেখিয়েছে। ইতি

রাজু

নলিনী সাহা দেখলেন হতেব লেখা নিঃসন্দেহে তাঁর ছেলে রাজুর। সাহা মশাই খুব ভয় পেয়ে গেলেন। দশ হাজার টাকা! কোথায় পাবেন তিনি এত টাকা? দু'তিন হাজার টাকা হলেও না হয় কথা ছিল।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে চুপ করে বসে রইলেন তারপর চিঠিখানা পকেটে নিয়ে উঠে পড়লেন। কর্মচারীদের বললেন

দোকান বন্ধ করে তোরা বাড়িতে চাবিটা দিয়ে দিবি। রাজুর মাকে বলবি আমি স্থরেশ কবরেজের বাড়ি ঘুরে বাড়ি যাব।

স্থরেশ কবরেজ তখন তাঁর বৈঠকখানা ঘরে তক্তপোশের ওপর বসে সামনে ডেসকে কাকে চিঠি লিখছিলেন। নলিনী সাহা ঘরে ঢুকে তক্তপোশের ওপব বসে কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন

কবরেজ তোমার ছেলের কোনো খবর পেলে?

শুকনো মুখ তুলে কবরেজ বললেন, না ভাই আমার ছেলের কোনো খবব পাই নি

তুমি তোমার ছেলের খবর পাবে না আমি জানতে পেরেছি।

স্থরেশ গুপ্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তবে তাঁর চাঁছু নেই? তাঁব চোখ ছল ছল করে উঠল। তিনি বললেন:

খবর পাব না মানে? তুমি কি জানতে পেরেছ আমাকে বল, দেরি কোবো না, আমার বুকের মধ্যে কি রকম করছে।

আমি আমার ছেলের খবর পেয়েছি, এই দেখ, বলে নলিনী সাহা তার পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে দিলেন।

স্থরেশ গুপ্ত চিঠিখানা পড়ে বললেন, এত ভাই রাজু বাপধনের খবর, তোমার ভাই টাকা আছে, তুমি টাকা দিয়ে তোমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নেবে। ছেলেধরারা জানে আমার টাকা নেই তাই আমাকে চিঠি দেয় নি। তাছাড়া দু'জনে একসঙ্গে ছিল ন, চাঁছু হয় ত মারামারি করতে গিয়েছিল, তাকে হয় ত নিকেষ করেই দিয়েছে...

স্থরেশ গুপ্ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নলিনী সাহা

তাকে বলল, থাম কবরেজ, পৃথিবীতে তুমি একাই বুদ্ধিমান নও, ছেলেধরা হয়ত জানে আমার টাকা আছে কিন্তু তুমি যে নিঃসম্বল নও তাও তারা জানে, আমার কাছে দশ হাজার চেয়েছে তোমার কাছে না হয় পাঁচ হাজার চাইত কিন্তু তা তারা চায়নি কেন?

তা তা তা আমি কেমন ক'রে জানব নলিনী ?

তুমিই জান কবরেজ, নিজের ছেলেকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ আর আমার ছেলেটাকে গুম করে রেখে দশ হাজার টাকা দাবি করছ, জানি হে কবরেজ জানি, গতবছর আমার কাছে হাজার টাকা ধার চেয়েছিলে, আমার কাছে তখন টাকা ছিল না। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনি, বলেছিলে, "নলিনী তোমার ব্যবহার আমার মনে রইল"। এখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে এই ষড়যন্ত্র করেছ।

সুরেশ কবিরাজ নিজের শোক ভুলে গেল। নলিনী সাহার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলল, এসব অসম্ভব কথা তুমি কি বলছ নলিনী, ছেলে হারিয়ে তোমার মাথার ঠিক নেই, তুমি কি আমাকে আজ থেকে চেন? আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা হল? ছিঃ ছিঃ নলিনী অমন কথা বোলো না।

গত বছর সুরেশ কবিরাজের একটা ব্যাপারে হঠাৎ হাজার টাকার দরকার হয়েছিল মাত্র তিন দিনের জন্যে। সে টাকাটা তার বাল্যবন্ধু নলিনী সাহার কাছে বড় মুখ করে চেয়েছিল। ভেবেছিল বন্ধু তাকে ফিরিয়ে দেবে না। কিন্তু টাকা থাকা সত্ত্বেও নলিনী তাকে টাকা দেয় নি। সে ভেবেছিল সুরেশ টাকা শোধ দেবে না। তাই অতি দুঃখে সুরেশ কবিরাজ বলেছিল, "নলিনী তোমার ব্যবহার আমার মনে রইল"। ভাগ্যক্রমে সুরেশ কবিরাজের

এক 'রোগী' খবর পেয়ে সেই দিনই নিজে এসে সুরেশ কবিরাজকে হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সুরেশ কবিরাজের মান রক্ষা হয়েছিল এবং সুরেশ কবিরাজও তিন দিন পরেই টাকা শোধ ত দিয়েছিলই এবং তারপর থেকে সুরেশ কবিরাজ ঐ রোগীর কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওষুধের দাম ব্যতীত আজ পর্যন্ত আর কোনো পয়সা নেয় না।

সুরেশ কবিরাজকে নলিনী সাহা বলল, আমার মাথা ঠিক আছে। যা বলেছি ঠিক বলেছি, তা নইলে ছেলেধরারা তোমাকে চিঠি দিল না কেন?

ভাই নলিনী তোমার হাত ধরে বলছি অমন চিন্তা আমার মনেও স্থান পায়নি, অমন কথা বোলো না। কেন? সেদিন রাগের মাথায় যাই বলে থাকি আমি কি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখিনি, আগের মতো ব্যবহার করি নি?

ওসব তোমার কপট ব্যবহার কিন্তু মনে মনে ফন্দী আঁটছিলে। আমি তোমার বাড়ি থেকে এখন সোজা থানায় যাব।

থানায় যাবে কি? ফ্যানটম নাকি কে লিখেছে পুলিসে খবর দিলে ওরা যে রাজুর ক্ষতি করবে।

কে ক্ষতি করবে? করলে ত তুমি করবে, তোমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলুম, থানা থেকে বাড়ি ফিরে যেন দেখি রাজু বাড়ি ফিরে এসেছে, তুমি যাই কর টাকা তুমি পাবে না···

সুরেশ কবিরাজকে আর কোনো কথা না বলার সুযোগ দিয়ে নলিনী সাহা হন্ হন্ করে থানার দিকে চলল। থানা বেশ খানিকটা দূরে। ভাবল বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাই। বাড়িতে স্ত্রীকে

সব বলে যেই বাড়ির বাইরে এসেছে অমনি কোথা থেকে একটা ঢিল এসে নলিনী সাহার বুকে পড়ল।

ঢিলের আঘাতে নয়, নলিনীর বুকের ভেতরে যেন আঘাত লাগল। সে ভয় পেয়ে গেল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার বাড়ির ভেতর ঢুকল।

ঠিক আগের মতো কাগজে মোড়া ববার ব্যাণ্ড। সাবধানে কাগজখানা খুলে নিলেন। এবার লাল বল পেনে লেখা :

থানায় যাচ্ছ? পুলিস? সাবধান!
ছেলের মরামুখ যদি না দেখতে চাও ত
বাড়ি ফেরো! সব সময়ে নজর রাখছি।
ফ্যানটম

নলিনী সাহার আর থানায় যাবার সাহস হল না।

। জীবন সাহা ।

বেলা দুপুর। নলিনী সাহা একা তার দোকানে বসে আছেন। দোকানের ছোকরা কর্মচারী দু'জন খেতে গেছে। ওরা ফিরে এলেই নলিনী সাহা নিজে যাবে। এখনও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তা নলিনী সাহা অনেক বেলাতেই খায়, আবার দুপুরে একটু ঘুমিয়ে বিকেলে আবার দোকানে আসে।

দোকানে খরিদ্দার না থাকলে নলিনী সাহা হিসেবের খাতা নিয়ে বসে। ছেলের জন্যে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও খাতার দিকে তার মন ঠিকই ছিল।

পায়ের শব্দে নলিনী সাহা মুখ তুলে চাই । দেখল তার ভাই জীবন সাহা এসেছে। এ সেই জীবন সাহা যাকে সেদিন সন্ধ্যায় কমলপুরে ভূতের বাড়িতে পিনাকির ছোটকাকা মলয় দেখেছিল।

জীবন নলিনীর নিজের ভাই নয়, বৈমাত্র ভাই। জীবনের বয়স তিরিশ বত্রিশ হবে, বেশ চেহারা, শৌখিন, পরণে চকচকে চেক প্যান্ট আর গায়ে সিঙ্গাপুর লেখা ব্যানলন। ও বেশির ভাগ কলকাতায় থাকে। রেডিওর কারখানায় চাকরি করে বুঝি

ওদের বাবা মারা যাবার পর নলিনী সাহা সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন পাড়ার দুষ্ট লোকেরা বলে যে সাহা মশাই তার ছোট ভাইকে কম দিয়েছিলেন।

জীবন সাহা মাঝে মাঝে গ্রামে আসে, দাদা বৌদির কাছে এক আধবেলা থাকে। তারপর চলে যায়। গ্রামে তার একটা ছোট বাড়ি আছে, কয়েকটা ফলের গাছ, সেগুলো দেখতে আসে।

ভাইকে দেখে নলিনী সাহা মনে মনে একটু বিরক্ত হল কিছু জিজ্ঞাসা করল না। যেমন খাতা দেখছিল তেমনি খাতা দেখতে লাগল। জীবন দোকানে একটা চৌকিতে বসতে বসতে বলল

দাদা তোমার দোকানে আসতে আসতে শুনলুম যে রাজুকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না ? সে আর সুরেশ কবরেজের ছেলে নাকি বাড়ি থেকে পালিয়েছে ?

পালায় নি, এসব ঐ সুরেশটার বদমায়েসী।

কি রকম ? সুরেশ কবরেজকে ত আমি ভালমানুষ বলে জানি

ভালমানুষ না ঘণ্টা, একটা শয়তান, জীবন সাহা বলল

তোমার কথা বুঝলুম না দাদা।

নলিনী সাহা একটা বিড়ি ধরিয়ে সব ঘটনাটা বলেন। সব শুনে জীবন বলে, আমার ত মনে হয় দাদা এ একা সুরেশ কবরেজের কাজ নয়, এর মধ্যে অন্য কেউ আছে, অবিশ্যি তুমি চাও ত কবরেজের ওপর নজর রাখতে পার, ঐসব ফ্যানটম ট্যানটম নাম এ গেঁয়ো কবরেজের মাথায় আসবে না, কই চিঠি তু'খানা দেখি।

জীবন সাহা চিঠি তুখানা খুঁটিয়ে দেখে বলল, দেখ দাদা আমার সন্দেহ এর মধ্যে শহুরে কোনো লোক আছে। কি আর করবে দাদা টাকাটা দিয়েই দাও।

টাকা? বলিস কি জীবন? টাকা পাব কোথায়? তাহলে ত আমাকে পথে বসতে হবে, এই দোকান, জমি, সব বেচে ফেলতে হবে, আমি ভাবলুম তুই কলকাতায় থাকিস, একটা বুদ্ধি দিতে পারবি কিন্তু তুইও বলিস টাকা দিয়ে দিতে।

কিন্তু দাদা তোমার টাকাও থাকবে আবার ছেলেও থাকবে এ কি করে হয়, কিন্তু দাদা তোমার টাকা নেই একি কথা বলছ?

নেই তা বলছি না তবে অত টাকা নেই, আমি মেরে কেটে হাজার পাঁচ যোগাড় করতে পারি, তাতে কি হবে?

আমি কি করে বলব? আমি ত ছেলেধরাদের জানি না।

তা হলে কি করা যায়? একটা কিছু বল, আর ত সময় নেই।

জীবন সাহা গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবে। তারপর বলে,

হয়েছে, একটা কাজ করা যেতে পারে দাদা, আমার মনে হয়, তাতে তোমার টাকাও বাঁচবে হয়তো আর ছেলেকেও ফিরে পাবে।

কি রকম?

তুমি অন্ততঃ হাজার আষ্টেক যোগাড় করে রাখ আর এদিকে আমি থানায় যেয়ে পুলিসকে খবর দিই।



নলিনী সাহা যেই তার বাড়িতে ঢুকতে যাবে অমনি একটা ঢিল তার গায়ে এসে পড়ল

থানায় যাবি কি রে? ওরা ত বলেছে থানায় গেলে রাজুর বিপদ হবে।

তোমার দাদা কোনো বুদ্ধি নেই, আরে থানায় ত তুমি যাবে না, যাব ত আমি, ছেলেধরারা ত আমাকে চেনে না। আমি রোববার রাত দশটায় টাকা আর পুলিস নিয়ে ওখানে লুকিয়ে থাকব, আমি যখন ওদের টাকা দিতে যাব তখনি পুলিস ওদের খপ, করে ধরবে।

ওরা যে টাকা রেখে আসতে বলেছে ?

তা বলেছে বটে কিন্তু আবার দেখ তোমাকে একা যেতে বলেছে, তোমার হয়ে আমি যেন একা যাব।

তা ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস তখন না হয়, দক্ষিণ ডাঙ্গার জমিটা বন্ধক দিয়ে আরও তিন হাজার, মোট আট হাজারই যোগাড় করে তোকে দোব কিন্তু দেখিস ভাই, সবদিক সামলে চলিস, আমি এখন বাড়ি যাই, তুইও চল, আমার সঙ্গে দু'টো মুখে দিবি।

ঠিক আছে দাদা, তুমি এগোও, আজ গাছ থেকে ডাব পাড়াব, আমি তিনু মণ্ডলকে একটা হাঁক দিয়ে যাচ্ছি।

নলিনী সাহা যেই তার বাড়িতে ঢুকতে যাবে অমনি একটা ঢিল তার গায়ে এসে পড়ল। নলিনী সাহা ভাবলেন, ওরে বাবা লোক-গুলোর সাহস ত খুব। দিন দুপুরে আমার ওপর নজর রাখছে।

নলিনী সাহা ঢিলটা কুড়িয়ে নিল। ঢিলে মোড়া কাগজখানা খুলে নিল। তাতে লেখা আছে

> আমরা সব খবর রাখছি। পুরো দশ হাজারই চাই।
> সাবধান। টাকা কম হলে ছেলের হাত নয়ত পা
> কেটে বাদ দেওয়া হবে। **ফ্যানটম**

কোথা থেকে কে ঢিল ছুঁড়ল ? নলিনী সাহা এদিক ওদিক

চেয়ে দেখল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। সেইখানেই খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কি গো দাদা অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? কি হয়েছে?

জীবন সাহার কণ্ঠস্বরে নলিনী সাহা চমকে উঠল। ভাইয়ের মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড এক দৃষ্টে চেয়ে রইল তারপর আস্তে আস্তে চিরকুটখানা বার করে দিল।

জীবন সাহা সেটা পড়ল। কাগজখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপিঠ-ওপিঠ ভাল করে দেখল। তারপর বলল

হুঁ, ভাবিয়ে তুলল দেখছি, ঠিক আছে, এখন চল ত দাদা চান করে ভাত খেয়ে নাও তারপর আমি দেখছি কি করতে পারি।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নলিনী সাহা বলল, কি করবি?

জীবন সাহা বলল, আমি ভাবছিলুম কাল ভোরে যাব কিন্তু না, আর দেরি করা যায় না। আমি এখনি কলকাতা চলে যাই, কলকাতায় আমার এক বন্ধু আছে, তুখোড় গোয়েন্দা, তাকে আমি কালই গাঁয়ে নিয়ে আসি, সে ঠিক রাজুকে উদ্ধার করে দেবে।

গোয়েন্দা? সে ত বইয়েতেই পড়েছি, সত্যি আছে নাকি?

আছে বই কি, নইলে এসব কথা বইতে লিখল কি করে? তুমি ত সারাটা জীবন গাঁয়েতেই পড়ে রইলে, কিছু খবর ত রাখ না।

তা সে রাজুকে বার করে আনতে পারবে?

চেষ্টা ত করতে হবে, যাও যাও তাড়াতাড়ি পুকুরে ডুব দিয়ে এসে খেয়ে নাও তারপর আমাকে শ'দুই টাকা দাও, আমি আমার গোয়েন্দা বন্ধুকে নিয়ে আসি।

দু'শো টাকা? একশ দিলে হবে না?

আবে সে পাঁচশ আগাম না পেলে কোনো কেসে হাত দেয় না, আমাব বন্ধু বলে

তুই এখন একশ' নে তাবপব কাল এলে আব একশো যোগাড় কবে দোব এখন, বাজাব খুব খাবাপ, টাকাপয়সা মোটেই আমদানি নেই।

আবে তাকে কি তুমি দেখতে পাবে নাকি? কেউ টেবই পাবে না আমবা একজন গোয়েন্দা লাগিযেছি, ঠিক আছে এখন একশই দাও, আব একশ না হয় আমিই দোব, আমাবও ভাইপো ত!

খাওয়া দাওযা সেবে দাদাব কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে জীবন চলে গেল। যাবাব আগে বলে গেল, তুমি ভেব না দাদা তবে তুমি কিন্তু দশ হাজাবেব যোগাড বেখ তবে তোমাব ঐ টাকা আবাব তোমাব সিন্দুকেই ফিবে যাবে। কিন্তু আমাব বন্ধু বাজুকে উদ্ধাব কবে দিলে তাকে দু'হাজাব দিতে হবে আব শোনো তিনু মণ্ডল এলে তাকে দিয়ে ডাবগুলো পাডিযে বেখো আমি চললুম।

॥ চাঁদু ধরা পড়ল ॥

মিঠু আব দাপা ইসকুল গেছে। বায় মশাই ত সাইকেলে চেপে অফিস গেছেন বাড়িতে আছেন শুধু মিঠুব মা আব চাঁদু। চাঁদুর মতলব, মিঠুর মা দুপুরে একটু ঘুমোন, উনি ঘুমিয়ে পড়লেই সে পালাবে। বাজু এখনও আসে না তাকে চালান কবে দিল কে জানে?

চাঁদু এখন ভাবছে পুলিসে খবব দিলেই হত। পুলিস ঠিক ব্যবস্থা কবত, ওবা ঠিক গোপনে বাজুকে উদ্ধাব কবত। যাক যা হবাব তা হয়ে গেছে। এখন গিয়ে দেখে আসবে রাজু আছে কি না তারপর-

আর এখানে ফিরে আসবে না। রাজু উদ্ধার হলে একদিন রাজুকে নিয়ে মিঠু দীপার বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে এখন।

কিন্তু মিঠুর মায়ের আর ঘুমোবার নাম নেই। এ কাজ করছেন, ও কাজ করছেন, সব শেষে ডাল বাছলেন। কখন ঘুমোবে রে বাবা। মিঠু আর দীপা যদি ইসকুল থেকে ফিরে আসে? ফিরে আসুক গে। সে আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে তারপর একটা ছুতো করে কেটে পড়বে।

তার কান্না পেতে লাগল। রাজুর জন্যে খুব মন কেমন করতে লাগল।

যাক এক সময়ে মিঠুর মায়ের ডাল বাছা শেষ হল। তারপর হাত পা ধুয়ে এসে ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল এবং শোয়া মাত্রই ঘুম।

চাঁছু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে তবুও বেশ গরম; রোদ তখনও বেশ কড়া। চাঁছুর গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

সেই হানাবাড়ির সামনে চাঁছু এসে যখন দাঁড়াল তখন সে হাঁফাচ্ছে। চারদিক নিস্তব্ধ। ভীষণ গরম। বাতাস বইছে না, এমন কি গাছের পাতাটিও নড়ছে না।

চাঁছুর হঠাৎ গা ছম ছম করতে লাগল। কিন্তু ভয় পেলে ত চলবে না। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে চাঁছু নজর করতে লাগল। মনে হচ্ছে বাড়ির ভেতরে কেউ নেই। সে সাবধানে বাড়ির পিছনে গিয়ে সেই আমগাছটায় উঠল। আজও ঘরের জানালাটা খোলা রয়েছে। রাজুকে দেখা যাচ্ছে না।

চাঁদু খুব আস্তে সিস্ দেওয়ার মতো করে ডাকল, রাজু-উ-উ-উ

একটু পরেই জানালায় রাজুর মুখ ভেসে উঠল, চোখ ছল ছল করছে, মুখ শুকনো। চাঁদু জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছিস রে রাজু?

রাজু চাঁদুর কথার উত্তর দিল না। সে বলল, তুই যে বলেছিলি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবি? কি হল? এরা ত কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের কলকাতা চালান দেবে।

বাড়িতে কেউ আছে?

হ্যাঁ, মানদা বারান্দায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোচ্ছে? তাহলে তুই বাড়ির বাইরে চলে আয়।

কি করে যাব, আমার হাত পা বাঁধা।

তাই ত, আচ্ছা বাড়িতে ঢোকবার দরজা নিশ্চয় বন্ধ।

এবার চাঁদু এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। আমগাছে চাঁদু যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে বারান্দাটা বেশি দূর নয় কিন্তু লাফিয়ে বারান্দায় নামা যাবে না। বেশ অসুবিধে আছে।

চাঁদু দেখল সে যে ডালটায় বসে আছে সেই ডাল থেকে একটা শাখা ডাল ওপর দিকে উঠে গেছে। ডালটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। চাঁদু হিসেব করে দেখল যদি কোনো রকমে ঐ ডালটায় পৌঁছনো যায় এবং ডালের সরু ডগাটা যদি ধরে ঝুলে পড়া যায় তাহলে দুলতে দুলতে ঝুপ করে বারান্দায় নেমে পড়া যাবে।

চাঁদুর সাহস ত আছেই তা ছাড়া সে ত ব্যায়াম করে সেজন্যে তার দেহটা বেশ সাবলীল। দাঁতে দাঁত চেপে চাঁদু সেই সরু ডালের কাছে পৌঁছল তারপর ডালের ডগা ধরে দুলতে লাগল।

রাজু নিশ্বেস বন্ধ করে চাঁদুর ক্রিয়াকলাপ দেখছে, তার বুক

ঢিব ঢিব করছে। ফিস ফিস করে বলল, চাঁদু সাবধান, দেখিস! তার কথা শেষ হবার আগেই চাঁদু ঝুপ করে বারান্দায় নেমে পড়ল দারুন পরিশ্রম হয়েছিল। তাছাড়া ভীষণ উত্তেজনা। চাঁদু বারান্দার রেলিং ধরে দম নিতে লাগল।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইসারায় রাজুকে চুপ করতে বলে বারান্দা দিয়ে ছাদে গেল। ছাদ দিয়ে ভেতরের বারান্দায়। পা রেখেই দেখল মানদা উবুড় হয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

রাজু দরজায় দাঁড়িয়ে। চাঁদু প্যান্টের পকেটে করে একখানা ব্লেড এনেছিল। পকেট থেকে ধাঁ করে ব্লেড বার করে দ্রুত রাজুর বাঁধন কেটে দিয়ে বলল তুই নিচে গিয়ে থামের আড়ালে দাঁড়া আমি মেয়ে দুটোকে নিয়ে যাচ্ছি। বলে চাঁদু ঢুকল পাশের ঘরে।

মেয়ে দু'টোকে নিয়ে চাঁদু সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখল রাজু দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে চাঁদু বলল। চল চল পালা, পালা।

কিন্তু হায় শেষ রক্ষা হল না। ওরা উঠোনে নেমে পড়েছে আর সেই সময়ে দরজায় ধাক্কা। মানদা জেগে দরজা খুলে দিল।

খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে ঢুকল শশী গুণ্ডা, তারপর পাজামা পাঞ্জাবী পরা একটা লোক, মুখে গোঁফ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। এ হল সর্দার। উঠোনে পা দিয়েই তারা অবস্থাটা বুঝতে পারল সর্দার চিৎকার করে বলল।

শশী আগে ঐ কেলে ছোঁড়াটাকে ধর আমি এটাকে ধরছি রাজু ত ভয়েই আধমরা। তাকে ধরতে বিশেষ অসুবিধে হল না মানদা ততক্ষণে মেয়ে দুটোর চুল বেশ শক্ত করে ধরেছিল। চাঁদু

বাধা দেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু শশীর সঙ্গে সে পারবে কেন? শশী তাকে বেরাল বাচ্চার মতো কোলে তুলে নিল।

সবাই আবার বন্দী।

মেয়ে দু'টো ত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে আর চাদু হাত পা ছুঁড়েও কিছুই করতে পারছে না।

ওপরে উঠে মানদা আগে মেয়ে দু'টোকে বেঁধে ফেলল। সর্দার বলল, শশে ছোঁড়াটাকে ছাড়িস না, ওটাকে আমি খুঁজছিলুম ওকে যদি নারাণ গড়েপিটে নিতে পারে তাহলে ওস্তাদ হবে।

শশী চাঁদুকে নামিয়ে দিয়ে তার একটা হাত মজবুত করে ধরে রইল। চাঁদু হাত ছাড়াবার একবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বৃথা।

সর্দার রাজুকে বেঁধে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। রাজু বন্ধুর বিপদ আশংকা করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সর্দার তখন চাঁদুকে বলল, কিরে ব্যাটা কবরেজের-পো খুব সাহস যে তোর, বাঘের ঘরে ঢুকেছিলি যে বড়?

কবরেজের পো? লোকটা কি করে জানল? কিন্তু লোকটাকে চেনা মনে হচ্ছে। গলার স্বরটা কার? কিন্তু চাঁদু আর-চিন্তা করবার আগে তার গালে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় পড়ল, তারপর পাঁজরে ও পেটে ঘুঁসি। চাঁদু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সর্দার বলল, এই কেলে ছোঁড়াটাকে ছোট ঘরটায় ফেলে রাখ!

শশী চাঁদুকে নিয়ে সেই ছোট ঘরে রেখে এল। ঘরে একটা খালি তক্তপোশ ছিল। তার ওপর চাঁদুকে শুইয়ে দিল।

চাঁদুর খুব লেগেছিল ঠিকই কিন্তু সে সত্যিই অজ্ঞান হয় নি। সে অজ্ঞান হওয়ার ভান করছিল। শশী ঘর থেকে বেরিয়ে

যেতেই চাঁদু কান খাড়া করে শুয়ে রইল। ওদের কথা শুনতে হবে

সর্দার শশীকে জিজ্ঞাসা করল, নারান মণ্ডল কি বলল ?

নারাণ মণ্ডল বলল যে সে কাল সন্ধ্যাবেলায় আসবে। ভ্যা গাড়ি নিয়ে আসবে, ছেলেটা আর মেয়ে দু'টোকে নিয়ে যাবে।

টাকার কথা কিছু বলে নি ?

বলেছে, কাল পাঁচ হাজার দিয়ে যাবে, আর কিছু বলে নি

আর একটা ছেলে ত বাড়ল কাল আসুক তখন কথা বলে দেখ আর হ্যাঁ মানদা তুই বুঝি দুপুরে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিলি শোন্ ওসব ঘুমটুম চলবে না। আজ যা হল তা যদি আবার হয় ত তোকে খুন করে এইখানেই কবর দেব।

মানদা কোনো উত্তর দিল না। সর্দার বলল ভাগ্যিস আমি এসে পড়ে ছিলুম নইলে ত সবকটাই পালাত আর খুন হবার ভয়ে তুইও পালাতিস কিন্তু তুই পালাবি কোথায় ?

দেশলাই জ্বালার শব্দ হল। সর্দার বোধহয় সিগারেট ধরাল। মিনিটখানেক চুপচাপ তারপর সর্দার কথা আরম্ভ করল।

শশী এ তিনটে মানে আজকেরটা নিয়ে চারটে বিদেয় হলে আবার কাজ আরম্ভ করতে হবে তবে এ গাঁয়ে আর নয়, অন্য গাঁয়ে, মেয়ে বুঝলি ? নসিবপুরে আমি একটা ফুটফুটে মেয়ে দেখে এসেছি, আচ্ছা শোন শশী আমি যাচ্ছি, কাল সন্ধ্যার সময় আসব। নারাণ যদি আগে এসে পড়ে ত বসিয়ে রাখবি। হুঁসিয়ার হয়ে থাকবি। তোদের কথা আমার মনে আছে, কাল নারাণ মণ্ডল টাকা দিয়ে গেলে তোরাও পাবি। তাহলে আমি এখন চলি। একবার দেখে আয় ত কেলে ছোঁড়াটার জ্ঞান হল কিনা।

কথাটা শুনেই চাঁদু মটকা মেরে পড়ে রইল। শশী ফিরে গিয়ে লল। না এখনও জ্ঞান হয় নি।

ঠিক আছে, মুখে একটু জলের ঝাপটা দিলেই জ্ঞান ফিরে াাসবে। আমি চলি রে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল। চাঁদু বুঝল সর্দার নেমে গেল।

চাঁদু লক্ষ্য করল যে তার হাত পা বেঁধে রাখে নি আর বাইরে থকে ওরা দরজা বন্ধ করে রাখে নি। ওরা যদি ওকে খেতে নাও দয় সেও ভি আচ্ছা কিন্তু দরজাটা যদি খুলে রাখে আর হাত পা াাও বাঁধে তাহলে সে প্রথম সুযোগে ঠিক পালাবে।

চাঁদু তক্তপোশের ওপর চুপ করে শুয়ে রইল। শশী বা মানদা কৈছু কথা বলে কিনা শুনতে হবে, আওয়াজ শুনে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে ওরা কি করছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মানদা ঘরে ঢুকল। চাঁদু ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল। মানদা ঘরে এসেছে, তার হাতে একটা আলো। আলোটা নামিয়ে রাখল। নিজের মনে মনে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর চাঁদুব মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, ইস কি মারটাই খেয়েছে আহা গো।

মানদা প্রায় মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে রইল তারপর আলোটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। শশী বোধহয় বারান্দায় বসে ছিল, তাকে বলল ছোঁড়াটা ঘুমিয়ে পড়েছে রে?

ঠিক আছে, ঘুমোচ্ছে ঘুমোক, তোর খাবার তৈরি হক তারপর ওকে তুলে খাওয়াব এখন।

ছোঁড়াটাকে বাঁধবি না? মানদা জিজ্ঞাসা করল।

কি দিয়ে বাঁধব? যেটুকু দড়ি ছিল তাই দিয়ে ফর্সা ছোঁড়াটা আর মেয়ে দু'টোকে বাঁধতেই শেষ হয়ে গেল। রাত্রি বেলায় ও আর পালাতে সাহস করবে না, আমি ত বারান্দায় দরজার কাছে শুয়ে থাকব।

মানদা কোনো উত্তর দিল না। নিজের মনে মনে বলতে লাগল, যাই বাবা আমি আমার কাজ সেরে নিই, বসে থাকলে ত চলবে না, আমার ঢের কাজ।

।। পলায়ন ।।

বারান্দায় যেখানে হেরিকেন লণ্ঠনটা রাখা ছিল সেখান থেকে কিছু আলো ঠিকরে চাঁদুর ঘরে ঢুকছিল। চাঁদু দেখল ঘরে তক্তপোশ ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। শুধু একটা দড়ির আলনা, সেই দড়িতে ঝুলছে একটা শাড়ি, আর একটা গামছা।

কাঠের পাল্লা দেওয়া একটা দেওয়াল আলমারি রয়েছে। আলমারির ভেতরে কি আছে দেখতে হবে।

তক্তপোশে শুয়ে চাঁদু নানারকম চিন্তা করতে লাগল। একসময়ে মিঠু দীপাদের কথাও মনে পড়ল। ওরা হয় ত ভাবছে নিমাই ওরফে অজিত পালিয়েছে। বাড়ির কথাও মনে পড়ল।

আজ রাত্রেই ও পালাবে তবে রাত্রিবেলায় ত কলমিডাঙায় ফেরা যাবে না তাই ও কমলপুরেই মিঠুদের বাড়িতেই ফিরে যেয়ে ওদের বাবাকে সব বলবে। তারপর যা করবার রায় মশাই নিশ্চয় তাই করবেন। তবে যা করবার তা কাল বিকেলেই করতে হবে নইলে সন্ধ্যার সময় ত নারাণ মণ্ডল এসে ওদের কলকাতায় নিয়ে যাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে চাঁদু একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রি ত হয়েছে জানে না, মানদার ডাকে ঘুম ভাঙল। মানদা ডাকছে, ওই খোকা ওঠ ওঠ খাবার এনেছি।

চাঁদু আস্তে আস্তে উঠে বসল। মানদা খাবারের কাঁশিটা তক্তপোশের একপাশে রাখল। হেরিকেন লণ্ঠনটাও একধারে রাখল। চাঁদু দেখল কাঁসিতে রয়েছে চারখান রুটি কুমড়ো ভাজা, পেঁপের ডালনা আর খানিকটা আখের গুড়

চাঁদুর খুব খিদে পেয়েছিল। রুটিগুলো তখনও গরম ছিল। স পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাঁসি সাফ করে ফেলল আর চারখানা রুটি হলে ভাল হত। মানদা জল এনে দিল।

মানদা বলল, আর যেন পালাবার চেষ্টা করিস না। শশীটা বারান্দায় দরজার কাছে শুয়ে থাকবে। ওটা ভীষণ পাজি, তোকে হয়ত গলা টিপে মেরে ফেলবে।

চাঁদু ভাবল, তা শশী পারে। মানুষ ত নয় একটা দৈত্য।

তক্তপোশে শুয়ে চাঁদু শুনতে পাচ্ছে শশী আর মানদা বারান্দায় বসে খেতে খেতে ঘরোয়া গল্প করছে। একসময়ে ওদের খাওয়া শেষ হল। ক্রমশঃ কথা বলাও শেষ হল। সমস্ত বাড়িটাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে আর কোনো আওয়াজ নেই।

চাঁদু ভেবেছিল যে করে হোক সে জেগে থাকবে কিন্তু জেগে থাকবার জন্যে চাঁদুকে কোনো চেষ্টাই করতে হল না কারণ রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসতে লাগল আর তক্তপোশে তেমনি ছারপোকা।

কিছুক্ষণ পরে চাঁদু আস্তে আস্তে উঠে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল শশী বারান্দা থেকে ছাদে বেরোবার দরজাটা আগলে শুয়ে আছে। দরজাটায় খিল দেওয়া। ওটা খুললে তবে নিচে নামবার সিঁড়ি। কিন্তু শশী যে ভাবে শুয়ে রয়েছে তাতে দরজা খোলা সম্ভব নয়। দেখা যাক, অনেকে ত ঘুমের ঘোরে সরে যায়।

শশী ঘুমিয়ে পড়েছে। চাঁদু আর একটু অপেক্ষা করল। ঘরের ভেতর আলমারিটা এবার দেখা যাক। বারান্দায় হেরিকেন লণ্ঠন জ্বলছিল। পলতেটা নামানো ছিল। চাঁদু সাহস করে বেরিয়ে এসে আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল তারপর আলোটা সরিয়ে এমন জায়গায় রাখল যাতে ঘরে একটু আলো ঢোকে।

তালগাছের মাথায় প্যাঁচা ডেকে উঠল। চাঁদু অনুমান করল রাত্রি বারোটা বেজেছে। একে মশা ও ছারপোকার কামড় তারপর পালাবার উত্তেজনা, চাঁদুর ঘুম কোথায় পালিয়ে গেছে। সে তক্তপোশের ওপর চুপ করে বসে রইল। শেষ রাত্রি নাগাদ সে পালাবে তার মানে আর তিন বার প্যাঁচার ডাক শোনবার পর।

কাঠের পাল্লা দেওয়া আলমারিটায় কি আছে? তালা দেওয়া নেই, খুলেই দেখা যাক না ভেতরে কি আছে। তার আগে পা টিপে টিপে বারান্দায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল মানদা, মেয়ে দু'টো এবং রাজুও দিব্যি ঘুমোচ্ছে। কি করে, ঘুমোচ্ছে কে জানে। শশী ত মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। ওর ত গা ভর্তি লোম, মশা বসবার জায়গাই নেই।

চাঁদু আস্তে আস্তে আলমারিটা খুলল। একটাই মাত্র তাক রয়েছে। বাকি তাকগুলো কেউ খুলে নিয়ে গেছে। সেই তাকে

রয়েছে কাঁধে ঝোলাবার একটা ব্যাগ যাকে সবাই সাইড ব্যাগ বলে। আরে এই ব্যাগটা ত চাঁদু দেখেছে সর্দার না কে ঐ লোকটার কাঁধে! ভেতরে কি আছে? প্রথমে ওপরে হাত দিয়ে দেখল। মনে হচ্ছে ভেতরে একটা বড় টর্চ এবং আরও কি সব রয়েছে।

থলেটা সে তুলে এনে তক্তপোশের ওপর রাখল তারপর একে একে জিনিসগুলো বার করতে লাগল। টর্চটা বেশ বড় চার ব্যাটারির কাঁচ বসানো মাথাটাও বেশ বড়। তারপর বেরোল ছোট একটা বাক্স মতো যন্ত্র আর তার সঙ্গে তার দিয়ে জোড়া একটা ঘন্টা। বাক্স ও ঘন্টা মিলিয়ে কিছু একটা যন্ত্র হবে। দরকার নেই বাবা নাড়াচাড়া করে শেষে কি হতে কি হয়ে যাবে, ওটা থাক।

চাঁদু কিন্তু টর্চটা জ্বালবার লোভ সামলাতে পারল না। সে দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে যেই টর্চের সুইচটা টিপেছে অমনি দেওয়ালে আলোর বদলে দেখা দিল সবুজ ভূত।

তৎক্ষণাৎ চাঁদুর মনে পড়ল পিনাকির কথা। ইসকুলে পিনাকি বলেছিল না তার ছোটকাকা এই কমলপুর গ্রামে হালদারদের হানা বাড়িতে সবুজ ভূত দেখেছিল আর ভূতের চিৎকার শুনেছিল?

ভূত ত পাওয়া গেল, টর্চের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে, আর ঐ যন্ত্রটা বোধ হয় ক্ষুদে মাইক টাইক হবে। কিছু টিপলে বোধ হয় ঐ ঘন্টা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়।

চাঁদু লক্ষ্য করে দেখল এই টর্চের সুইচটা অন্য টর্চের মতো নয়। বেশ বড় এবং খাঁজ কাটা। খাঁজে চাপ দিতেই সুইচটা চাকার মতো ঘুরে গেল আর দেওয়ালে সবুজ ভূতও যেন চলতে লাগল।

চাঁদু খুব সাবধানে টর্চ এবং সেই অদ্ভুত যন্ত্রটা আবার থলের

মধ্যে ভরে রাখল। সে ঠিক করল এগুলো সে থলে সমেত নিয়ে যাবে।

ওগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে আবার প্যাঁচা ডেকে উঠল। চাঁহুর একবার ইচ্ছে হল এখনই বেরিয়ে পড়ে, তারপর তার ভয় হল। রাত্রে ত চৌকিদার রাস্তায় রোঁদ দিতে বেবোয়, যদি তার হাতে ধরা পড়ে যায়। কিংবা কোনো চোরেদের হাতে? তবে সে আর একবার প্যাঁচার ডাকের জন্য অপেক্ষা করবে তারপর বেরিয়ে পড়বে।

রাস্তায় যদি কাউকে দেখতে পায় তখন না হয় ভূতুড়ে টর্চটা জ্বেলে দেবে তাহলে সে যেই হক ভূত দেখে নিশ্চয় পালাবে।

ব্যাগটা তক্তপোশের ওপর রেখে চাঁহু বারান্দায় এসে আলোটা আবার কমিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে দিল। তারপর শশীর কাছে গেল। শশী এখন দরজা থেকে খানিকটা সরে এসেছে তবুও ওকে ডিঙিয়ে দরজা খুলতে যাওয়া বিপজ্জনক।

চাঁহু নিজের ঘরে ফিরে তক্তপোশের ওপর বসে রইল। জল তেষ্টা পেয়েছিল কিন্তু কি করবে? তেষ্টা দমন করতে হল।

বসে থাকতে থাকতে চাঁহুর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল কিন্তু এক সময়ে প্যাঁচার কর্কশ ডাকে সে চমকে উঠল। আর দেরি নয় এবার পালাতেই হবে। সাইড ব্যাগটা হাতে নিয়ে চাঁহু ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল।

ভাগ্যিস বারান্দায় আলোটা ছিল তাই রক্ষা নইলে অন্ধকারে কিছুই দেখা যেত না। শশীকে ডিঙিয়ে দরজা ঘেঁসে চাঁহু কোনো রকমে দাঁড়াল। তার বুক এত জোরে ঢিব ঢিব করছে যে সে নিজে তার আওয়াজ বেশ শুনতে পাচ্ছে।

দরজাটা নিজের দেহ দিয়ে বেশ করে চেপে ধরে খুব আস্তে আস্তে খিলটা তুলে আবার আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল। খিল খোলা হয়ে গেল। খুব আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ওদিকে যেয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিল।

হাত বুলিয়ে দেখল শেকল রয়েছে। আন্দাজে হাত বুলিয়ে শেকল লাগিয়ে দিল। অবশেষে মুক্তি। চাঁদু তখন কাঁপছে।

ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে চাঁদু সেই ভুতুড়ে টর্চটাই বার করে জ্বালল। সবুজ ভূত বেরিয়ে এলেও বেশ আলো হল।

চাঁদু উঠোনে এল ফিকে জ্যোৎস্না উঠেছে। এখানে অতটা অন্ধকার নেই। চোখ ক্রমশঃ অভ্যস্ত হল। ওটা কি? চাঁদু সভয়ে দেখল উঠোনের এপাশ দিয়ে ওপাশে বেশ বড় একটা সাপ চলে গেল। বোধ হয় ব্যাং ধরতে গেল। চাঁদু গ্রামের ছেলে, অনেক সাপ দেখেছে। ভয় কেটে গেল।

আর সে দাঁড়াল না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। এবার সে সত্যিই পালাতে পেরেছে। পুব আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। ফর্সা হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এখন সে যাবে কোথায়? মিঠুদের বাড়ি? তাই যাবে। বাড়ির দরজার বাইরে বসবার জন্য যে আঁথনিটা আছে তার ওপর শুয়ে থাকবে।

রাস্তা দিয়ে চাঁদু হাঁটতে লাগল। নিজের মনে হাঁটছে। ভাবছে রাজু কি করে উদ্ধার হবে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তার খেয়াল হল সে বোধহয় পথ ভুল করেছে। অন্ধকারে সেই কলা-বাগানটা চিনতে পারে নি।

চাঁদু খুব চালাক ছেলে। ভাবল রাত্রির অন্ধকারে আর বেশি না হাঁটাই ভাল। দেখা যাক কাছাকাছি কোথাও রাতটা কাটানো যায় কি না। একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে যেন। সেদিক সে এগিয়ে গেল।

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি মন্দির। মন্দির ঘিরে চারিদিকে উঁচু দাওয়া। মন্দিরের উলটো দিকে চাঁদু চলে গেল। চাদু সাইড ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোরের বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত চাঁদু ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। চোখে রোদ এসে পড়েছে তাইতেই ঘুম ভেঙে গেছে।

কাছেই ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। পুকুরের জলে হাত মুখ ধুয়ে সে রাস্তায় এল। একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছিল। তারই মতো একটা ছেলে গাড়িটা চালাচ্ছিল। চাঁদু তাকে জিজ্ঞাসা করল এটাকি কমলপুর?

না, কমলপুর ত দু'কোশ উত্তরে, এটা ত পঞ্চাননতলা, ঐ ত পঞ্চানন শিবের মন্দির তুমি বুঝি কমলপুর যাবে? তা বেশ ত গাড়িতে উঠে পড়, আমি কমলপুর যাব।

॥ এদিকে রায়বাড়িতে ॥

মিঠু দীপার মা ঘুম থেকে উঠে চাঁদুকে দেখতে পেলেন না। ভাবলেন কোথাও গেছে বোধহয়। পুকুরে হয় ত মাছ ধরছে এখনি আসবে নিশ্চয়।

ইসকুল থেকে মিঠু আর দীপা ফিরে এসেই জিজ্ঞাসা করল। মা নিমাইদা' কোথায়?

কি জানি কোথায় গেছে, এখনি আসবে বোধহয়।

কিন্তু বিকেল হয়ে গেল তবুও চাঁহুর দেখা নেই। বিকেলের আলো কমতে কমতে সন্ধ্যা হল। মিঠু দীপু আর কয়েকজন বন্ধু পাড়াটা ঘুরে এল। চাঁহুর দেখা নেই।

সাবিত্রী দেবী চৌকাঠে জল দিয়ে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে ছোঁড়াটাকে পেলি না?

কিছুক্ষণ পরে রায় মশাই বাড়ি ফিরতেই সাবিত্রী দেবী খবরটা দিলেন। দুর্গাবাবু বললেন।

দেখি আজ ফেরে কি না নইলে কাল আফিস ফেরতা একবার কলমিডাঙাতে যেয়ে খোঁজ করব এখন, ওখানে আমার চেনা লোক আছে, সুরেশ কবরেজ, গ্রামের সকলে তাকে চেনে।

পরদিন সকালেও চাঁহু ফিরে এল না।

দুর্গাবাবু ভাত খেয়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে সাইকেল চেপে অফিস রওনা হলেন। একজন রাজনীতিক নেতার মৃত্যুর জন্যে সেদিন অফিস ছুটি হয়ে গেল।

দুর্গাবাবু ভাবলেন ভালই হল। কলমিডাঙায় যেয়ে সুরেশ কবরেজের সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু সেই বা কি করবে? এদিকে ছেলেটা ত আবার পালিয়েছে!

কবরেজ মশাই তখনও তাঁর বৈঠকখানায় বসেছিলেন। মন খুব খারাপ। নলিনী সাহা কিছুক্ষণ আগে এসে আর একবার শাসিয়ে

গেছে। বলে গেছে আজ বিকেলের মধ্যে রাজুকে ফিরিয়ে না দিলে আমি দারোগাকে খবর দোব।

কবিরাজ মশাই থানা পুলিসের ভয় করছেন না, তাঁর মনটা খুব খারাপ লাগছে। রাজু না হয়, ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে কিন্তু তাঁর ছেলেটা কোথায় গেল।

এমন সময় আগন্তুককে দেখে, আরে, দুর্গাবাবু আসুন, অসময়ে যে, খবর সব ভাল ত, আজ অফিস যাবেন না?

না, অফিস চটি হয়ে গেল, ঐ যে রামরতন বন্দ্যোপাধ্যার মারা গেছেন না, সেজন্যে

বসুন, ওরে কে আছিস, একটা ডাব কেটে আন, রায়মশাইকে দে, পাখিটা কোথায় গেল?

আপনি অত ব্যস্ত হবেন না কবরেজমশাই, আমি এসেছি একটা খবর নিতে, আপনি হয় ত বলতে পারবেন।

কিসের খবর জিজ্ঞাসা করছেন?

আপনাদের গ্রামে কি একটি ছেলে হারিয়েছে? নাম বলছে অজিতকুমার গুপ্ত, ডাকনাম নিমাই।

ছেলে ত হারিয়েছে তবে একজন নয় দু'জন, একটি হল আমার ছেলে আর অপরটি হল আমারই বন্ধু নলিনী সাহার ছেলে তা নলিনীর ছেলেকে ছেলেধরারা ধরেছে, তারা দশ হাজার টাকা দাবি করে চিঠিও দিয়েছে আর আমার ছেলের আমি আজও সন্ধান পাই নি। কিন্তু আমাব ছেলের নাম তো অজিত বা নিমাই নয়, তার নাম চন্দন ডাক নাম চাঁদু

দুর্গা বাবু বললেন এ ছেলেটির বারো চৌদ্দ বছর বয়স হবে,

শ্যামলা রং স্বাস্থ্য ভাল। মুখখানা বেশ কচি কচি, পরণে হাফ প্যাণ্ট আর হলদে রঙের একটা গেঞ্জি।

আরে হয়েছে ঐ ত আমার ছেলে কিন্তু নিজের নাম বলে নি কেন ? তা সে বুঝি আপনার বাড়িতে আছে। সঙ্গে ওর বয়সী একটা ছেলে নেই ?

না ত ও ত একাই এসেছিল, আমার স্ত্রীর কাছে বলেছিল নাকি সৎমা, বাবা জুতো মেরেছিল তাই রাগ করে চলে এসেছে।

কি আশ্চর্য, চাঁদু ত এত মিথ্যা কথা বলে না, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। তা সে কি করছে ?

কবরেজ মশাই, সে কেন মিথ্যা কথা বলেছে তা আমিও বুঝতে পারছি না কিন্তু হয়েছে কি সে আমার বাড়িতেই দু'দিন ছিল, কাল দুপুরে বেরিয়েছে, আজ সকালে ফিরে আসে নি।

আপনার বাড়ি থেকে আবার পালিয়েছে ?

অথচ পালাবার কোনো কারণ নেই

সুরেশ কবরেজ তক্তপোশ থেকে নেমে এসে চটিটা পায়ে গলিয়ে বললেন : দুর্গাবাবু আপনি আমার সঙ্গে একবার চলুন ত। এই কাছেই নলিনী সাহার দোকানে যাব। আমাকে যা বললেন তাকেও সেই কথাগুলো বলবেন।

যাচ্ছি আপনার সঙ্গে কবরেজ মশাই কিন্তু তাঁকে এসব কথা বলতে হবে কেন ?

চলুন দুর্গা বাবু পথে যেতে যেতে বলব, নলিনীর সন্দেহ যে আমি তার ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছি

পথে যেতে যেতে সুরেশ কবরেজ সমস্ত ঘটনা বললেন মায় সেই

ফ্যানটমের চিঠি পর্যন্ত এবং দুঃখের বিষয় যে নলিনী তার বাল্যবন্ধু হয়েও তার কোনো কথাই বিশ্বাস করছে না।

ওরা দু'জনে নলিনী সাহার দোকানে যখন পৌঁছল তখন দোকাদ দু'চারজন খরিদ্দার ছিল। তারা চলে যেতেই সুরেশ কবিরাজ নলিনী সাহাকে বললে দোকানের ছোকরা দু'জনকে সরিয়ে দিতে।

নলিনী সাহা কর্মচারী দু'টিকে তাগাদায় পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু একটু ঝাঁঝিয়েই বললেন তুমি আবার নতুন ফন্দী কি এঁটেছে? ইনি কে? তোমার ভাগীদার বুঝি

দুর্গাদাস রায়, ওপারে কমলপুরে থাকেন, চাঁদু ওঁর বাড়িতে তিন দিন ছিল কিন্তু কাল দুপুর থেকে মূর্তিমান কোথায় পালিয়েছে।

এরপর সুরেশ কবরেজ সমস্ত ঘটনাটা নলিনীকে বললেন। দুর্গা বাবুও মাঝে মাঝে কথা বলছিলেন।

নলিনী সাহা বললেন: দেখ সুরেশ তোমাদের সব কথা শুনলুম, শোনো ভাই আমি বেশ বুঝতে পারছি যে এর মধ্যে একটা চক্রান্ত রয়েছে নইলে তোমার এক ফোঁটা ছেলে বাড়ি না ফিরে নাম ভাঁড়িয়ে এর বাড়িতে তিন দিন থেকে তারপর পালাল কেন?

সেইটেই ত আমরা বুঝতে পারছি না ভাই নলিনী।

আর এতে বোঝবার কি আছে, যাদের দিয়ে তোমরা আমার রাজুকে চুরি কয়িয়েছ তাদের কাছে ছোঁড়া কিছু খবর দিতে গেছে।

নলিনী তুমি বাড়াবাড়ি করছ, তুমি আমাকে যা ইচ্ছে বলতে পার তা বলে আমার বন্ধুকে অপমান করতে পার না।

আমি তোমার বন্ধুর নাম ধরে কিছুই বলিনি, ঠিক আছে, আমি স্নানাহার করে কমলপুর যাচ্ছি তারপর ওখানকার থানার

রোগা সিরাজুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে তোমার বন্ধুর বাড়ি যাব। দারোগা ইনকুয়ারি করবে যা সত্য তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

বেশ যা ভাল বোঝো তাই কর, আমিও দুর্গা বাবুর সঙ্গে কমলপুর যাচ্ছি, দেখা যাবে কে দোষী আর কে দায়ী।

॥ ধরা পড়ল বলে ॥

সুরেশ কবরেজ আর দুর্গাবাবু যখন কমলপুরে পৌছলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ওরা ঘরে বসতে না বসতেই রাস্তায় একটা সোরগোল, জানালা দিয়ে দুর্গবাবু দেখলেন সিরাজুদ্দিন দারোগা আসছে সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল এবং নলিনী সাহাও রয়েছে।

দুর্গাবাবু কোর্টে চাকরি করেন, এসব দারোগা পুলিস ভয় পান না কিন্তু গ্রামের লোক একটা মজা পেয়েছে তারা ভাবছে দুর্গাদাস রায়ের বাড়িতে যে ছোঁড়াটা সে নিশ্চয় চোর তাকে ধরতেই পুলিস আসছে।

দৃশ্যটা দেখে দুর্গা বাবু হাঁক দিলেন, মিঠু ছেলেটা ফিরেছে রে?

হ্যাঁ বাবা নিমাইদা এসেছে, এই যে আসছে।

চাঁদু ঘরে ঢুকতেই সুরেশ কবরেজ তার কান ধরে বললেন, হতভাগা পাজি ছেলে মিছে কথা বলেছিস কেন? রাজু কোথায়?

সেই সময়ে সদলে দারোগা ঘরে ঢুকলেন। দুর্গাবাবু তাকে ঘরে বসালেন। সিরাজুদ্দিন বললেন, নলিনী বাবুর কাছে আমি শুনেছি, আমার মনে হচ্ছে কেস খুব সিরিয়াস কিন্তু কবরেজ মশাইয়ের সেই ছেলে কোথায়?

তুর্গাবাবু বললেন, হ্যাঁ, আজ ফিরেছে।

সিরাজুদ্দিন দারোগা বললেন, এই ছোকরা, এদিকে এস, ঐ বেঞ্চিতে বোসো, কি হয়েছে সব সত্যি কথা বলবে। মিছে কথা বলেছ কি হাড় গুঁড়িয়ে দোব, বল যা বলবার আছে।

চাঁতু তখন বলতে আরম্ভ করল, জামতলার মাঠ থেকে ফুটবল খেলে ফেরবার পথে যা ঘটেছিল তারপর সব বলল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তা বাবা তুমি ত দেখছি খুব সাহসী ছেলে কিন্তু তুমি সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে তোমার বাবাকে সব বললে না কেন?

ওরা যে বলেছিল পুলিস টের পেলে রাজুকে কেটে ফেলবে।

নলিনী সাহা ফুঁসছিল। সে বলল। বাজে কথা দারোগা বাবু ধড়িবাজ ছেলে...

আপনি চুপ করুন সাহা মশাই, কেস এখন আমার হাতে, আপনারা কেউ কিছু বলবেন না। চাঁতু শোনো, তুমি সেই বাড়িটা চেনো ত।

চিনি বই কি, আপনাদের ত আমি সেখানে নিয়ে যাব, আজই সন্ধ্যা বেলায় নারাণ মণ্ডল এসে রাজুকে নিয়ে যাবার কথা আছে, আমি কিন্তু আপনাদের সেই সবুজ ভূত এখনি দেখাতে পারি।

পার? কই দেখাও ত?

চাঁতু বাড়ির ভেতরে গিয়ে সেই কাঁধে ঝোলানো থলেটা নিয়ে এসে বলল, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করতে হবে।

তাই করা হল। ঘর অন্ধকার। চাঁতু সেই ভূতের টর্চের সুইচ টিপে ঘোরাতে লাগল। দেওয়ালে সবুজ ভূত চলে বেড়াতে লাগল।

ঐ সভাতে চাঁদু ও রাজুর বাবা মা ত ছিলেনই, মিঠু, দীপা তাদের বাবা মা এবং রত্না, মুনিও ছিল।

চন্দনের বুকে যখন হেডমাষ্টার মশাই পদক পরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন সে কি প্রচণ্ড হাততালি আর সে কি উল্লাস।

সেদিন সভার শেষে বন্ধুদের কাছে চাঁদু সবুজ ভূত ও ভূতের চিৎকারের রহস্য ভেদ করল। বলল, রাজুর কাকা ত কলকাতায় রেডিও কারখানায় কাজ করত। সেখানে টেপ রেকর্ডার আর মাইকের সাহায্যে ভূতের চিৎকারটা তৈরি করেছিল। আর সবুজ ভূত? ও ত কলকাতায় ম্যাজিকের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ঐ দুটোই রাজুর ছোটকাকার সাইডব্যাগে রাখা থাকত। সুযোগ পেলেই টর্চ জ্বেলে ভূত দেখাত কিংবা বোতাম টিপে ভূতের চিৎকার শোনাত। সবই ম্যাজিক, বুঝলি না। ওগুলো অবিশ্যি পরে থানায় আবার জমা দিতে হয়েছিল।

সেই সঙ্গে তুটো টর্চ জ্বলে উঠল। একে একে সকলেই গ্রেফত হল। সকলের হাতে হাতকড়া। রাজু ছুটে গিয়ে তার বাবা জড়িয়ে ধরেছে। মেয়ে দু'টিও কান্না আরম্ভ করেছে বোধহয় আনন্দে

সিরাজুদ্দিন দারোগা একটা কাজ করেই বসল। সে সর্দা গোঁফ দাড়ি টান দিয়ে খুলে দিল। চশমাটাও।

নলিনী সাহা চিৎকার করে উঠল, একি জীবন তুই ?

হ্যাঁ, সাহা মশাই আপনার ফ্যানটম ভাই।

এরপর আর কি ! তুই গ্রামেই চাঁতুর জয় জয়কার। সবার মু মুখে চাঁতুর নাম, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সকলে চাঁতুর গল্প করে

। ।।

কিছুদিন পরে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে স্থানী সংবাদে প্রচার করা হল, হুগলি জেলার কলমিডাঙার মাধ্যমি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান চন্দন গুপ্ত তার বন্ধু ও সহপা শ্রীমান রাজকিশোর সাহাকে ছেলেধরার হাত থেকে উদ্ধার কার্যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সেজন্যে রাজ্য সরকার তা বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন বলে স্থির করা হয়েছে।

চাঁতুর ইসকুলেও একদিন সভা করে চাঁতুকে অভিনন্দন জানানো হল। করালী স্যারই সভার আয়োজন করলেন। সেই পিনাকি যে খবরটা প্রথমে দিয়েছিল সে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইল। বাপ্পাদিত জয় ও বাবলু আবৃত্তি করল, 'আমাদের হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'। হেডমাস্টার মশাই ঘোষণা করলেন শ্রীমান চন্দনকে একটি পদক দেওয়া হবে এবং এখন থেকে সে বিনা বেতনে পড়তে পাবে।

বেশ, দোষীরা ধরা পড়লে সরকার থেকে পুরস্কার পাবে, নাও চল আর দেরি নয়।

॥ সর্দার কে ? ॥

সিরাজুদ্দিন দারোগা হালদারদের হানাবাড়িটা ভাল করে চেনেন তবুও তিনি চাঁতুকে সঙ্গে নিলেন।

সকলে যখন হানাবাড়ির কাছে পৌছল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। বাড়িটার চারদিকে ছোটবড় অনেক গাছ আছে। গাছের আড়ালে সবাই লুকিয়ে রইল। সকলে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল কিন্তু নলিনী সাহা মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল।

একটা জোর আলো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। বাড়ির কাছে এসে আলো নিবে গেল। ওরা সবাই দেখতে পেল কালো প্যান্ট আর জামা পরা বেঁটে মতো একটা লোক হানাবাড়িতে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে অন্যদিক থেকে সর্দার এসে বাড়িতে ঢুকল।

সকলে দেখতে পেল দোতলায় আলো জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, শশে কেলে ছোঁড়াটা গেল কোথায়? একি? আমার সাইডব্যাগ কোথায় গেল···

একটা গোলমাল আর ঝটাপটি শোনা গেল। তারপর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দশ পরে ওরা ওপর থেকে নিচে নামল, দারোগা বাবু ও সেপাইদের নিয়ে ওৎ পেতেই ছিলেন। প্রথমে বেরোল সর্দার। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজুদ্দিন দারোগা গর্জে উঠল, হ্যাণ্ডস আপ, খেল খতম সর্দারজী।

সিরাজুদ্দিন দারোগা ত অবাক। বলল, আরে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হালদারদের হানাবাড়িতে এই ভূতই দেখেছিলুম, দেখি টর্চটা, এই দরজা জানালা খুলে দাও।

সিরাজুদ্দিন দারোগা দেখেন টর্চের বালব আর কাঁচের মধ্যে সরু ও সবুজ রঙের ছোট্ট একটা ফিল্ম লাগানো রয়েছে। আলো জ্বলে উঠলেই সেই ছবি দেওয়ালে পড়ে আর কৌশল করে ফিলমটা নাড়ানোও যায়। টর্চটা নামিয়ে রেখে সিরাজুদ্দিন দারোগা চাঁদুকে বললেন ওটা কি দেখি।

চাঁদু সেই বাক্স আর ঘণ্টাটা দাবোগার হাতে দিল। দারোগা বলল। আরে এটা ত টেপ রেকর্ডার আর এই ঘণ্টার মতো এটা মাইক। কি সব নাড়াচাড়া করে তিনি একটা বোতাম টিপতেই ...তর সেই চিৎকারও শোনা গেল।

সিরাজুদ্দিন দারোগা চাঁদুকে আরও কিছু প্রশ্ন করলেন।

নলিনী সাহা ও সুরেশ কবিরাজকেও কিছু প্রশ্ন করলেন। তারপর তিনি ঘড়ি দেখে একজন কনস্টেবলকে বললেন, শিউচরণ তুমি থানায় যাও, রামবহাল আর কলিমুদ্দিনকে নিয়ে এস আর আমার রিভলভারটাও আনবে।

শিউচরণ কনস্টেবল দু'জন সেপাই এবং দারোগার রিভলভার নিয়ে ফিরে এল। সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই। দারোগা বললেন এবার তাহলে রওনা হওয়া যাক, নলিনী বাবু, সুরেশ বাবু, দুর্গাবাবু, আপনারাও চলুন, চাঁদু তুমিও চল আচ্ছা চাঁদু তুমি যে বললে সর্দারকে তুমি চেনো কিন্তু তার নাম বললে না ত?

চেনা মানে গলার স্বরটা চেনা মনে হচ্ছিল।